শক্তি সঙ্গ শক্তি প্রসঙ্গ

আবুবকর সিদ্দিক

আজ ২৩শে জুন ১৯৯৫। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের দৈহিক প্রস্থানের আজ আক্ষরিক অর্থে বলতে গেলে ঠিক ত্রিমাসিকী। এ বছরেই ২৩শে মার্চ বৃহস্পতিবার ভোর ৫টার দিকে কলকাতার বেলেঘাটা জোড়ামন্দির এলাকায় ৫নে রামমোহন মল্লিক গার্ডেন লেনে তাঁর স্বনির্মিত বাড়িটি থেকে অনেকখানি দূরে বিশ্বকবির শান্তিনিকেতনে পূর্বপল্লীর ১৯ নং ঘরে হৃদরোগের কঠিন সাঁড়াশিতে জীবনের স্পন্দন রহিত হয়ে যায় কবির। হয়তো ওই শান্তিনিকেতনই চিরঅশান্ত ও শান্তিফেরারি কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জন্যে নিয়তি নির্দিষ্ট শান্তিধাম। আজীবন আপাদমস্তক কবিতাসর্বস্ব শক্তির প্রাণবায়ু বাংলা কবিতারই মহত্তম তীর্থপীঠের অসীম আকাশে লীন হয়ে গেল; প্রতীকী হলেও এই দৈবযোগের তাৎপর্য কালান্তরীও বটে।

খবরটা পেয়ে প্রথম দিকে বিশ্বাস করতে পারিনি। বুকের মধ্যে কোথাও একটা সুড়ঙ্গমতো 'ব্ল্যাক হোলে' নিঃশব্দ ধাক্কা লাগে। ঘুমের ঘোরে চলতি ট্রেন থেমে গেলে যেমনটা। মাত্র সাড়ে পাঁচ মাস আগের একরিল নেগেটিভ, মুহূর্তে ঝলসে ওঠে চোখের সামনে: তাঁর বাড়িতে বসে শেষ আড্ডা। বরাবরকার ফুর্তিবাজ শক্তির সেই অন্যরকম আত্মমগ্ন চেহারা। শক্তি ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমার নীরব আত্মীয়তার বয়স তিরিশ পেরিয়ে। পোশাকি সাহিত্য বন্ধুদের ভিড়ে শক্তি ছিল আমার মনোবাসিত গোপন সখা। কবি বিষ্ণু দে'র জীবৎকালে তাঁর দুর্লভ ভালবাসার ছায়ার পাশে প্রচ্ছায়ার মতো বেড়ে উঠেছিল আমার ও শক্তির প্রীতিলতা। বিষ্ণু দে'র মৃত্যুর মুর্হূতে আমি আমার 'জলরাক্ষস' উপন্যাস নিয়ে ঢাকা শহরে মামলার আসামি। মৃত্যুর খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ যেতে পারিনি। পরে প্রণতি বৌদির চিঠিতে জানতে পারি, মৃত্যুর কিছুদিন আগে কবি আমার কথা বলেছিলেন। আজ শক্তিও চলে গেল আমার সীমিত পরিমাণ প্রণয়ভূমিতে ধস ধরিয়ে। যেতে পারিনি। তিন মাস হয়ে গেল মীনাক্ষী বৌদি, বাবুই (তিতি), তাতারের কাছে যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

বড় মানুষের মৃত্যুশোক স্বভাবত পর্যবসিত হয় সমারোহের রোলে। শক্তির মৃতুতেও তাই হয়েছে ও হতে থাকবে। আমার মত মৃদুচারীকে হয়তো সেখানে ভিড়ে তলিয়ে গিয়ে ক্রনিক অ্যাজমার আক্রমণ ধ্বস্ত হতে হত। পাথরচাপা মন নিয়ে এখানে এই রাজশাহীতে সময় কাটে। শব্দচাপ উপচে ওঠে বুকের ভিতর। কাগজে-কলমে যোগাযোগ আর হয় না। মার্চ-এপ্রিলের রেকর্ড খরাদাহ বিষাদবাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। কী যে এক স্যুডোস্থাণুত্বে অবচেতনেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে ছিল কলম। আজ তিনমাসের ব্যবধানে সেই মানসিক অবস্থা প্রশমিত। এখন সে স্মৃতিজৈবনিক লেখাটি লিখতে বসেছি, তাকে বলা যেতে পারে, শূন্য পূরণের অসাধ্য প্রয়াস।

দুই

১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারিতে একমাসের ভিসা নিয়ে আমি যখন শৈশবের শহর কলকাতায় বেড়াতে যাই, তখন আমার পুঁজি বলতে ছিল একটি কটি যৎকিঞ্চিৎ ধন; (ক) গত পাঁচ বছর ধরে 'সমকাল' গোষ্ঠীর লেখক, —এই পরিচিতি; (খ) 'নতুন সাহিত্য', 'পরিচয়' (তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে নিষিদ্ধ), 'কবিতা', 'উত্তরসুরী', 'পূর্বাশা' ইত্যাদি পত্রিকার ওই দুই বাংলার সাহিত্যের গোগ্রাসী পঠনাভ্যাস আর (গ) পশ্চিমবঙ্গে তাবৎ আধুনিক লেখকদের সম্পর্কে একটা রোমান্টিক কৌতূহল ও আকর্ষণ (আমার দুর্ভাগ্য, ততদিনে জীবনানন্দ দাশ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রয়াত)। তখনো আমার কোনো কবিতার বই বেরোয়নি। ১৯৫৯ সালে জাফরভাই সমকাল প্রকাশনী থেকে বের করার উদ্যোগ নেন। পরে ১৯৬৯ -এ জ্যোতিপ্রকাশ দও ও হায়াৎ মহমুদের আন্তরিক চেষ্টায় প্রথম কবিতার বই 'ধবল দুধের স্বরগ্রাম' বের হয়। ওদের প্রকাশনীর নাম ছিল সাহিত্যশিল্প। তো এই স্বরবিত্তে মালিক আমি সেদিন কোন মুঢ় সরলতায় কলকাতায় সাহিত্যমহারথীদের বৈঠকখানায় ও পত্রিকায় আড্ডাগুলোয় ঢুঁ মারার হঠকারিতা দেখাতে গিয়েছিলাম, জানিনে, তবে এইটুকুই মনে আছে সার, সীমাহীন সাহিত্য পিপাসা আর লেখক হবার দুরাশাই ছিল মূল চালিকাবৃত্তি। তখনো আমি 'কৃত্তিবাস' -এর প্রচ্ছদ দেখিনি। সুনীল - শক্তির খবর জানি না। কফি হাউসের হুল্লোড় শুনিনি।

বুদ্ধদেব বসু ও প্রতিভা বসুর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় ১২ই ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার ১৯৬৩-এর সন্ধেয় ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউর দোতলায় 'কবিতা ভবনে'। সে কাহিনী এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। শুধু উল্লেখ্য, দীর্ঘস্থায়ী সেই উদার আড্ডা ও অট্টহাসির ফাঁকে সামনে বসে থাকা অমিয় দেবকে বুদ্ধদেব বসু বলেন, এই যে অমিয়, তুমি ওঁকে একদিন কফিহাউসে নিয়ে গিয়ে শক্তি-সুনীলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও। আমি তাঁদের কুলজি জানতে চাই। উত্তরে বুদ্ধদেববাবু বলেন, ওরাই তো নিউটার্ক। 'কৃত্তিবাস' করছে। আপনার ভাল লাগবে। ১৭ই ফেব্রুয়ারি রবিবার সন্ধেয় আমাকে দেব কফি হাউসে নিয়ে যাবেন, ঠিক হল।

এর মাঝের দিনটি প্রচণ্ড ব্যস্ততায় কেটে গেছে। সেই পরম সুখস্মৃতি এখন জীবনের প্রৌঢ় বেলায় দুর্লভ যখের ধন। ১৭ই ফেব্রুয়ারীর সন্ধ্যেয় অমিয় দেব আর আমি কফি হাউসে গিয়ে হাজির। সঙ্গে আমার কলকাতাসাথী নাড়ু ওরফে নারায়ণ মুখোপাধ্যায়। ও তখন ৭৭/২ পার্ক স্ট্রিটে রাজ্য মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড অফিসে ফিন্যান্স বিভাগের এনকোয়ারি সেকশনে চাকরিরত। মূল বাড়ি আমাদের বাগেরহাটেই কচুয়া থানায় মঘিয়া গ্রামে। লেখালেখির স্রোতে ঠিক নয়। আমারই টানে চলে এসেছে কফিহাউসে।

কফি হাউসের সেই রমরমা আড্ডা আজও আছে কি না জানি না। টেবিলে টেবিলে চাক বাঁধা গুঞ্জন ও হল্লা। ঝলমলে বিদ্যুতের আলো। ট্রেতে পট সাজিয়ে বেয়ারাদের ছুটোছুটি। সিগ্রেটের পাকানো রিং। চশমার ফ্রেমে পিচ্ছিল জেল্লা। মুখর যৌবন ও ইন্টেলেকচুঅ্যাল দীপ্তি। সেই শীতান্তিক সন্ধ্যায় পাঁশুটে বুড়ি কলকাতার বুকে এক বিচ্ছিন্ন জাহাজি কেবিনের জলসা জমিয়ে তুলেছে যেন।

হকচকিয়ে যাবার কথা আমার মতো এক পাঁচবছরি বাংলার অধ্যাপকের। কিন্তু আমার কান্ডারি তো অমিয় দেব। প্রসন্ন হাসির তরুণ বুদ্ধিজীবী। যে চক্রব্যূহের মধ্যিখানে নিয়ে বসিয়ে দিলেন আমাকে, তার সদস্যরা সবাই সত্যিকার অর্থেই তরুণতুর্কি। হাসি ও কথা, যা-ই ঠিকরে বেরুচ্ছে তাঁদের কণ্ঠ থেকে, সব কিছু উচ্চরোলে। মাঝে মাঝে নিচু স্বরে চকিত বাক্যবিনিময়। হায়! অচেনার দংগলে আমি চিরদিন বেখাপ মুখগোঁজা। কিন্তু আমার পাশপোর্ট যে বুদ্ধদেব বসু। অমিয় দেবের মুখে 'বুদ্ধদেব বসু পাঠিয়েছেন' শুনে সবাই একযোগে আগ্রহ নিয়ে তাকান আমার দিকে। ফলে আরও বিব্রত হয়ে উঠি আমি। যে যুবক তাঁর বাঁ দিকের চেয়ার আমাকে ছেড়ে দেন, তাঁর ঝুলপকেটে ধুতির সাদা কোঁচা মুখজোড়া কুচকুচে কালো গালপাট্টা দাড়ি। মাথাভর্তি ঝাঁকড়া কালো চুল। গলায় তারস্বর। হাসি ঠা ঠা ঝাঁঝালো মধ্যদিনের আকাশভাঙা। নিজে থেকেই আর বাড়িয়ে না বললেন, শক্তি চট্টোপাধ্যায়। টেবিলের ওপাশে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, তারপর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমীর সেনগুপ্ত ও 'মানসী' সম্পাদক সমর সোম।

নতুন করে অর্ডার গেল, স্যান্ডউইচ ও কফির। কফিহাউসের সেই বিখ্যাত ও কুখ্যাত কফি, দীপক মজুমদার যাকে বলেন: শয়তানের মতো কালো আর ঘৃণার মতো তেতো। আসর জমে উঠে মুহূর্তের মধ্যে। পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য নিয়ে আন্তরিক আগ্রহ সবার। 'সমকালে'র খবর রাখেন। আমার ব্যাগে 'সমকালে'র চলতি সংখ্যাটি ছিল। ওর থেকে আমার 'জ্ঞানী বিধাতার ইচ্ছা ও দয়া' কবিতাটি বেশ কেটে কেটে পড়লেন শক্তি। তারপর পকেট থেকে দুটো কাগজ বের করেন। একটা 'আজি অসতর্ক ভাবে' আর একটা 'ডালিম' কবিতার পাণ্ডুলিপি। দুটো ও দিনই অর্থাৎ ১৬.২.৬৩ তারিখে লেখা। বেশ উল্লসিত ও গম গম করে স্বরে আবৃত্তি করে শোনালেন শক্তি। টগবগে উচ্ছ্বাসে খাপখোলা কণ্ঠ। দুটো কবিতাই দিয়ে দিলেন আমায়। আশ্বাস দিলেন, মূল কপি রেখে দিয়েছেন ঘরে। দেশে ফিরে করুণের ধনের মতো আগলে রেখে দিয়েছিলাম কবিতাদুটি। একদিন আমার এক অনুজ কবি তার নববিবাহিতা স্ত্রীসহ আমার বাগেরহাটস্থ কলেজরোডের বাসায় বেড়াতে এসে গোটা দিন খাওয়াদাওয়া হইহল্লা কবিতাপাঠের পর বৈকালিক চা - পর্বের উপসংহার স্বরূপ শক্তির ওই কবিতাদুটি ও আমার কিছু বই (তার মধ্যে বুদ্ধদেব বসুর সই করে উপহার দেওয়া বই ও 'কবিতা' পত্রিকার সেটও ছিল) নিয়ে বিদায় হয়। অগস্ত্যযাত্রা! এ জীবনে আর ফিরে আসেনি সে সব সম্পদ। তবে শক্তির দুটো কবিতাই খাতায় টুকে রেখে দিয়েছিলাম 'সমকালে' পাঠাব বলে। হয়নি পাঠানো। কবিতাদুটি উদ্ধার করা যাক এই বত্রিশ বছর পর:

আজি অসতর্কভাবে
শক্তি চট্টোপাধায়

আজি অসতর্কভাবে চলো যাই দেবদারু-বনে
বীথিকা উহারে কেহ বলিবে না, অপরাহ্নকালে
উহাতে সে-সুদর্শন শকটের যাতায়াত নাই,
বাবুদের সেইসব আগ্নেয় পিপাসা মিটিয়াছে।
এবার আমরা আসি বিদায় লইব দেবদারু
মানুষের কাছ হতে বিদায়ের সিদ্ধান্তও আছে
যশস্বী হওয়ার মতো ভ্রান্তি আর কোনোখানে নাই
প্রসাদের অভিমান প্রাসাদেরই ভাঙিতেছে ভার।
নূতন সমাধি হতে নূতন সমাধিগৃহে যায়
মৃতদেহ নিমন্ত্রণে, পদতলে বেঁধে-না প্রখর
জুতায়, তবুও এই নিষ্প্রাণ সৈকতে খেলা করে ক্লাউন,
প্রেতের সারি, মীরিয়াড মর্যাদা প্রধান
এখানেও মানুষের শস্য, স্বপ্ন ইমারত, নদী

সবই আছে, দেবদারু, আজি হইতে বিদায় লইব।
১৬.২.১৯৬৩

ডালিম
শক্তি চট্টোপাধ্যায়

একটি ডালিম আমি অন্তর দিয়াই বুঝিয়াছি—
ডালিমের আত্মীয়তাবোধ আমি করেছি পরখ
করতল ভরে তার মর্ম হতে দানা ঝরে পড়ে
মহান জালিম লয়ে কবে তীব্র কটাক্ষ ক্রন্দন।

হৃদয় এমনি কত উন্মাদ মর্মরে সংগঠিত
হৃদয় এমনি কত করতলে ভরিয়া গিয়ায়ে
কহিয়াছে কথা কত পূর্ণিমার আলিসায় বসি
এখন আলিসা নাই, পূর্ণিমা আধেকলীন নাই।
ডালিমের তলে আমি বহুকাল স্টিমার মাস্তুল
দেখিয়াছি বন্দীদের মত স্থির আবেদনময়
বুঝাতে পারিনি তার সংস্থাপক আমারও বিচার
করেছেন সমভাবে—স্টিমার একাকী ভাসি যায়
দূর আলিন্দের পানে জনহীন মেরুন স্টিমার
সাগরের নীল জল খেলা করে, নির্মমতা করে।
১৬.২.১৯৬৩

কলকাতা কফিহাউসে কবিদের সেই গুলজার সভা সেদিন অচিরেই আমাকে তার অন্দরে প্রবেশাধিকার দিয়ে দেয়। ‘কৃত্তিবাসে’র জন্য দুটি কবিতা চেয়ে নেন সুনীল। ‘মানসী’র সম্পাদকও কবিতা নেন। ঠিক হল, কৃত্তিবাসগোষ্ঠী (আসলে গোটা কলকাতার সাহিত্যজগতের) সঙ্গে আমার সব রকম যোগাযোগের প্রতিনিধিত্ব করবে নাড়ু। অথচ ২৪শে ফেব্রুয়ারি দেশে ফিরে আসার পর আমারই নিবৃত্তিদোষে এই চমৎকার সংযোগব্রিজ ধীরে ধীরে গুটিয়ে আসে। আজ স্বীকার করতে সংকোচ নেই, সাড়ে আটাশ বছরের যুবক আমি ১৯৬৩-তে কলকাতা শহরে পা দিয়ে সাহিত্য -সংস্কৃতির ডানেবাঁয়ে সারা তল্লাট ঢালাওভাবে চষে ফিরি স্বাধীন নেশায়-আকণ্ঠ তৃষ্ণায়। মেলার মাঠে ঢুকে পড়লে যেমনটা হয়। একদিকে নীরব বিদ্রোহী কাজী নজরুল ইসলাম, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, সৌমেন্দ্র ঠাকুর, প্রেমেন্দ্র মিত্র: অন্যদিকে গোপাল হালদার, বিষ্ণু দে, যামিনী রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় দাশ, সতীন্দ্রনাথ মৈত্র : আবার একদিকে সত্যজিৎ রায়, অসিতবরণ, অনিল চ্যাটার্জী, উত্তমকুমার, সৌমিত্র চ্যাটার্জী : অন্যদিকে মনোজ বসু, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, রাম বসু, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অসীম রায় : অবস্থাটা প্রায় সেই সনৎ সিংহের ছড়াগানের জগতের মত। এদিকে তখন ‘দেশ’-‘আনন্দবাজারে’, তারাশংকর, বুদ্ধদেব বসুরা ‘আগ্রাসী’ চিনাদের বিরুদ্ধে পাইকারি বিবৃতি ছেপে দেশাত্মবোধের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছেন, ওদিকে নীরেন্দ্র রায় কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে দাঁড়িয়ে আমার ও ধনঞ্জয় দাশের সঙ্গে গল্প করতে করতে হঠাৎ পাশ দিয়ে অতিক্রমণরত মনোজ বসুকে আমার সঙ্গে সৌজন্যহাসি বিনিময় করতে দেখে চাপা গর্জনে শ্রেণিকটাক্ষ বর্ণণ করেন; ‘বনজ মোষ’ (১৪.২.৬৩-এর সন্ধ্যে রাতে)

যা বলছিলাম, দেশে এসে আমি তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের উত্তাল রাজনীতির তোড়ে বাম চিন্তাদর্শের পূর্বভিতে আরো নিরেট সম্পৃক্তি গেড়ে নিই। ফলে বুদ্ধদেব বসু নন; বরং বিষ্ণু দে’র সঙ্গে সূত্র গূঢ়তর হয়ে ওঠে। ৬৭-র পর নকশাল আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠলে কমলেশ সেনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাকা হয়ে আসে। স্বাভাবিক ভাবেই কৃত্তিবাসগোষ্ঠীর দিকে ঝোঁকটা ফিকে হয়ে যায়।

অথচ নাড়ুর সঙ্গে চিঠি চালাচালি আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। কারন সে ততদিন বেহালার রাস্তায় বাম মোর্চার ডাকে খাদ্য আন্দোলনের মিছিলে লিড-পজিশনে। বাড়ি আসার আগে আরো দুদিন নাড়ুকে নিয়ে কফি হাউসে যাই; ১৯-২-৬৩ সোমবারে ও ২৩-২-৬৩ শনিবারে। শেষ দিনে খগেন দত্তের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় বন্ধুরা। শক্তিকে দেখা গেল নতুন পোশাকে। তবে সেই একই টালমাটাল মেজাজে। ওর সে সময়ের ঠিকানা ছিল ৪নং অধর দাশ লেন, কলকাতা -৪।

বাংলা কবিতায় শক্তির তখন সিংহবিক্রমে জমি দখলের কাল সবে। সমকালীনরা তোলা দিচ্ছে মহাউল্লাসে। অগ্রাজেরা

জহুরির নজর নিয়ে জরিপ করেছেন। ১৪.২.৬৩ বৃহস্পতিবার বিকেলবেলায় ১৯নং মহাত্মা গান্ধী রোডের দোতলায় 'পরিচয়' পত্রিকা অফিসে আমার কবিতাপাঠের আসর বসে। সেখানে অন্য অনেকের সঙ্গে শঙ্খ ঘোষ ও অশ্রুকুমার সিকদারের সঙ্গে পরিচয় হয়। শঙ্খ বাবু তাঁর বাসার ঠিকানা দিয়ে বেড়াতে যেতে বলেন। পরদিন ১৫ই ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সকালের দিকে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিল্পী যামিনী রায়ের বাড়িতে যাবার কথা আমার। তারাশংকরবাবুর বাড়িটা ঠিল তখন পি-১৪১, সিসিওএস, টালা পার্ক, কলকাতা-২ ঠিকানায়। টালা ওয়াটার ট্যাংকের নীচে। তার খানিকটা আগে বেলগাছিয়া ট্রামডিপো এলাকায় ১১৭/১, ইন্দ্র বিশ্বাস রোডে থাকেন কবি শঙ্খ ঘোষ। টালা পার্কে যাবার পথে বেশ সকালের দিকে আমি প্রথমে যাই তাঁর বাড়িতে। সেখানে তখন অশ্রুবাবুও ছিলেন। সেদিন কথায় কথায় শঙ্খ ঘোষ (অশ্রুকুমার সিকদারও) আমার সামনে মন্তব্য করেন : শক্তির সত্যিই শক্তি আছে।

সেই এপিগ্রাফিক পূর্ববচনের সত্যতা আপন শক্তিবলে উত্তরকালে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করেন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

তিন

কলকাতায় যাবার আগে আমার সত্তাটুকু ছিল ঘোরতর জীবনানন্দ-অধিকৃত। বাগেরহাটে ফিরে মওলানা ভাসানীর বজ্রনির্ঘোষ ও তারপর গণআন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাপর্ব পর্যন্ত বিষ্ণু দে-ই ছিলেন পথিকৃৎসুহৃদ। কিন্তু এরই মধ্যে একদিন 'হে প্রেম হে নৈঃশেব্দ্য', 'সোনার মাছি খুন করেছি' ও 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান' —শক্তির এই তিনটে কাব্য একসঙ্গে পেয়ে যাই আমার এক বন্ধুর বদান্যতায়। সময়টা অন্ত্যষাট। শপথ করে বলি, একেবারে পাগলের মতো ভালবেসে ফেললাম শক্তির কবিতাকে। ঘুরপাক খেতে খেতে কোথায় যে এসে আটকে গিয়ে কাঁপছিল আধুনিক বাংলা কবিতা। নালি খুঁজে পাচ্ছিল না বেরুবার। এখন দেখা গেল, আবার সেই দেশজ প্রাকৃত ডিকশন, জীবনানন্দ দাশের পর, প্রায় ক্লিশে হয়ে আসা খাপ থেকে বেরিয়ে ঝকঝকে আনকোরা রঙের ছটা ছিটিয়ে ছুটে চলেছে লাউডগা সাপের মতো। স্বভাবকবিত্বের গাড্ডায় স্খলিত হতে হতেও কী এক ম্যাজিক্যাল পরবিদ্যায় তুলে নিয়ে যায় কোনো ব্যাখ্যাতীত বিষাদ ও বিচ্ছেদের নিঃসঙ্গতায়। আসক্তির মত্ততা ও মৃত্যুমগ্ন বিচ্ছিন্নতা :— এই সব কুহকের ঢাল পাড়ি দিয়ে দিয়ে বাংলা কবিতাকে কোথায় কোন ধূসর রহস্যদেহলিতে নিয়ে যেতে চান শক্তি, থই পাইনে। উন্মত্ত ডিলান টমাস ও মিস্টিক রিলকে, স্যুররিয়্যালিস্টিক জীবনানন্দের ককটেল উপ্‌চিয়েও যেন ব্যাখ্যার আরো অনেকখানি বাকি থেকে যায়। এ আরেক নতুন মাত্রার কবিতা। জীবন ও মৃত্যুকে একাকার করে দেওয়া অদ্ভুত পেগ্যান উৎসব। চোখকান বুঁজে একগাদা উদাহরণ দিয়ে যাই :

ক। পাবো না কখনো তারে আর, একবার পেয়েছিনু, যেন বাল্যে খুব দুরদেশ গর্ভের সমানে কাছে
বারেবারে আসা তার হয় না কখনো জানি তবু ডাকি ডাকি...
('খেলনা')

খ। আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে। ('রজাসন্ধ')

গ। কাঠগুলো শ্মশানে পুড়লে চিতা। কবে আমায় পোড়াবে অমন রূপোলি স্রোতে।
('অন্তিম কৌতুক')

ঘ। কাল যখন শ্মশানযাত্রীদের বলেছিলাম তোমরা এগোও আমি কী যেন ফেলে এসেছি,আনবো।
('কে পশ্চাতে')

ঙ। যাবো না আর ঘরের মধ্যে অই কপালে কী পরেছো ('পরস্ত্রী')

চ। যেখানে থেকে গিয়েছিলাম সেখানে ফিরে আসছি
পথের ধারে, পোড়ো জলার বুকের কাছে ভাসি আমি শালুক অনভিজাত;
('যৌবন থেকে বামে')
('ভ্রান্তি')

ছ। জল যায় রে শিলা আমার বক্ষপট দহে

জ। হৃদয়ে আমার গন্ধের মৃদুভাব,
তুমি নিয়ে চলো ছায়ামারীচের বনে
স্থির গাছ আর বিনীত আকাশ গাঢ়
সহিতে পারি না, সে সখি, অচল মনে ('ছায়ামারীচের বনে')

ঞ। কখনো বুকের মাঝে ওঠে গ্রীস ('কখনো বুকের মাঝে ওঠে গ্রীস')

ট। আঁচলের খুঁট ধরে করবো ও ভয়াল দেহ (আঁচলের খুঁট ধরে করবো')

ঠ। বহুদিন বেদনায় বহুদিন অন্ধকারে হয় হৃদয়ের উদঘাটন
সে সময় পর্দা সরে যায় প্রাচী দিগন্তের দিকে—
যে-সময়ে মেহগনি ডুবে যায় মেঘে-মেঘে ('বহুদিন বেদনায় বহুদিন অন্ধকারে')

ড। হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান ঘুরতে দেখেছি অনেক
তাদের হলুদ ঝুলি ভরে গিয়েছিলো ঘাসে আবিল ভেড়ার পেটের মতন
('হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান')

ঢ। পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে, দেয়ালে দেয়াল, কার্নিশে কার্নিশ,
ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে বাড়ি ফেরার সময়, বাড়ির ভিতর বাড়ি, পায়ের ভিতর পা, বুকের ভিতর বুক ('সে বড় সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়')

ণ। আমি সোনার একটি মাছি খুন করেছি রাতদুপুরে ('নীল ভালোবাসায়')

শ্রেণিচেতনা- শ্রেণিচরিত্র-শ্রেণীদ্বন্দ্বের গজ-ঘোড়া-নৌকার ছকআঁটা শুচিবাইয়ের বাইরে কবিতার এক মুক্ত এলাকায় আমাকে এনে তুলল শক্তি কবিতা। বহুদিন পর আলাদা স্বাদ আলাদা বাতাস কিন্তু একেবারে আজনবি নয়। কমলকুমার মজুমদারের কথাসাহিত্যে অতি আঁটসাঁট প্রতীককোটেড কমিটমেন্টের ডিসিপ্লিন ভেদ করার পর যে বিকল্প মননশীলতার পুরস্কার জোটে, অনেকটা তার কাছাকাছি বলা যায়। অথচ বাস্তবত, বাংলা গদ্য পাঠের অভিজ্ঞতায় খাটুনি ও ভোগান্তির দিক দিয়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্তকেও ছাড়িয়ে যান কমলকুমার। এই বিপ্রতীপতা শিরোধার্য। তবে এহে বাহ্য। বরং বলব, তাঁর গদ্যকন্টকী মিথই শেষকথা নয়। চালচিত্র ও চরিত্রের গভীরে গভীরতম কুয়োতলায় লেজারবিম সম্পাত করার মুন্‌শিয়ানায় কমলকুমার একমেবাদ্বিতীয়ম। আরো বলি, সাবঅল্টার্ন জগতের ভাস্কর হিসেবে বাংলা কথাসাহিত্যে কমলকুমার জহুরি পরী বটে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মৌলিকত্বকে আমি এই নজরে লক্ষ করি বলে তার কবিতা আমাকে কাঁচপোকার মতো টানে। মাঝে মাঝে দৈববাণীর মতো এসে পাখাশাট লাগিয়ে কোত্থেকে বুক কাঁপিয়ে দিয়ে যায় তার কোনো কোনো লাইন, এমনকি আস্ত কবিতাটিও। মনে হয়, নিউক্লিয়ার বম্বিংয়ে বা স্টিফেন হকিংসের গাণিতিক ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ব্রহ্মাণ্ড লয় হয়ে যাবে, আর নিবাত নিরীশ্বর মহাশূন্যে অজর নক্ষত্রের মতো জ্বলতে থাকবেঃ 'মন্ত্রের মতন আছি স্থির', 'মানুষ বড়ো কাঁদছে', 'কোথাকার তরবারি কোথায় রেখেছো', 'ছায়ামারীচের বনে', 'অবনী বাড়ি আছো', 'অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি', 'উটের মধুর আরব এসেছে কাছে', 'প্রভু নষ্ট হয়ে যাই' প্রভৃতি অসংখ্য অলৌকিক নামগুচ্ছ।

এসবেরই পাশে ইউরোপের রাস্তার পাশে দামি দামি গাড়ির ভাগাড়ের মতো স্তুপীকৃত হয়ে আছে শক্তির যথেচ্ছ অতিপ্রজ বাহুল্যছিষ্টি। যেন চিনিকলের দুধসাদা চিনির চাঙের পাশে ইক্ষুর বিশাল বর্জ্যপাহাড়। আর তাই নিয়েই 'বোদ্ধা'দের যত উষ্মা ও গোসা। তাঁদের উপক্রমটা যেন, এই সব আগাছাই শক্তিকে আমূল উপড়ে উড়িয়ে দিতে যথেষ্ট। একজন পরিমল চক্রবর্তী তাঁর 'তিরিশ-পরবর্তী বাংলা কবিতার দিকচিহ্ন' বইয়ে স্থূল র‍্যাডার দিয়ে শক্তির কবিতায় 'কুশ্রী যৌনতা' 'আবেগী উচ্ছ্বাসের রঙীন ফানুস' 'নিরালম্ব শূন্যতা'-'শব্দ ও অর্থের মধ্যবর্তী যথার্থ কবিসুলভ কোনো দ্বন্দ্বরক্তিমতার অভাব', 'যুগপৎ প্রগতিবিহীনতার ও দিকচিহ্ন অজস্রতা'র (প. ২১১-২১৪) উর্ধ্বে ও গভীরে কোনো কালোত্তরী পরমানু আবিস্কারের ঋদ্ধিতে পৌঁছুতে ব্যর্থ হয়েছেন। বারীন্দ্র বসু তাঁর 'কবিতা, আধুনিকতা ও আধুনিক কবিতা' বইতে শক্তির 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (৫৭)-তে একই সঙ্গে 'সুররিয়ালিজম' ও 'সমাজতান্ত্রিক বক্তব্যের ইঙ্গিত' খুঁজতে গিয়ে রীতিমত গলদঘর্ম (পৃ. ১৪৭) ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'একালের বাংলা কবিতা : নিবিড় পাঠ' বইয়ে 'অবনী বাড়ি আছো' কবিতাটি তত্ত্বতলাশিতে মেড-ইজ মার্ক স্কুলবুক-ফর্মুলা প্রয়োগ করা হয়েছে (পৃ. ১৬৩-১৬৮)। যাঁরা যোগ্য বৈদগ্ধ্য নিয়ে শক্তির কবিতায় সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করেন (অরুণ সেন : 'কবিতায় দাম কবিতার মুক্তি' পৃ. ১১৯-১২০); তাঁদের সততার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ, যদিও রুচিভেদের অবকাশ থেকেই যায়।

কবুল করতে শ্লাঘা না থাক, অপ্রবৃত্তি নেই, জাত-বোহেমিয়ান শিল্পী যত বেশি প্রতিভাবান, তত বেশি অতিসৃষ্টি ও তজ্জনিত অনাসৃষ্টিতে স্বচ্ছন্দ। মনে হয়, বাংলা কবিতায় এই জন্মখুঁতের দিক দিয়ে নজরুলের পরই শক্তি চট্টোপাধ্যায়। বাংলা কবিতা 'আধুনিকত্বে'র ক্রমাগত কূটৈষা ও মন্ত্রগুপ্তিপ্রায় সন্ধ্যাভাষায় চর্চার যখন সদরঘাট থেকে পিছু হটতে হটতে স্রেফ কুলীনকুলসর্বস্ব ধরে রাখে; তখন দীপক-অমিতাভ-কবিতা - বেলাল-সমীর-শরৎ-সুনীল-শক্তিদের সেই জীবনে জীবনগোচরের বিষামৃত থেকে, বিশেষ করে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কলম থেকে যে কবিতা চোঁয়ানি স্বতঃধার অজচ্ছলতায় উপচিত হয়, আপামর তরুণ - তরুণী কাব্যপ্রেমীর তার মধ্যে হাঁপ ছাড়ার আর অমিতবিহারে স্বস্তি পায়। এতকাল পর জীবনানন্দের বুড়ি ছুঁয়ে আসার পরে বুঝি বাংলা কবিতা একটি লাগসই জবাব পেয়ে গেল 'বিচিত্রাভবন সালিশসভা'র (৪ঠা ও ৭ই চৈত্র ১৩৩৪; ১৯২৮খ্রি)। হায় রে কবে কেটে গেছে সজনীকান্তের কাল!

জানি, আমাদের বাঁধাছাঁদা সমাজব্যবস্থায় চাঁইবাসাপর্ব ঘিরে পুরুষপরম্পরায় কুতক্কো জমবে। কিন্তু আমি মনে করি, কর্দমাক্ত নীর বাদ দিয়ে পুণ্য ক্ষীরটুকুই লেহ্য। মহাকাল দস্তয়ভস্কি, অস্কার ওয়াইল্ড, জাঁ জেনেস, বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো, ভার্লেনের ভালো অক্ষয় জয়টিকা এঁকে দিয়েছে। পাঠকদের কাছে আজ আবদুল মান্নান সৈয়দ, রফিক আজাদ, সিকদার আমিনুল হক, আসাদ চৌধুরী, নির্মলেন্দু গুণ, আবুল হাসান, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের লেখাটাই নন্দিত (সাবদার সিদ্দিকীর আফলা হারাকিরি যদিও তাঁর পঙ্গু মেধার দৌড়ের ব্যাপার)। কবিদের ছন্নপনাতে চৌচির

হয় পরিবার, পুষ্পিত হয় কবিতালতা, আর তাঁদের মরণোত্তর বৈজয়ন্তী পুষিয়ে দেয় সুদেআসলে পারিবারিক 'লোকসান'। তাঁদের এই শাহাদতের নুন খেতে খেতে একবেলার তরেও কি অধমর্ণের স্মৃতিতে হানা দিয়ে ওঠে না সেই নিয়ত অঙ্কুশাক্ত স্নেহকাঙাল উত্তমর্ণের চোখমুখ? এ সব মন্ত্রগুপ্তি বাদ দিয়েই ষাটের বাংলা কবিতার গর্ভাধান বিধায়ক দলিল-পর্চা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়ান ডিগ্রি - শিকারি গবেষকেরা হয়তো। অথচ অবধারিতভাবে জেরা ও জরিপ করে দেখতে হবে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'কুযোতলা' (১৯৬১), 'আমি চলে যাচ্ছি (১৯৭৬), 'দাঁড়াবার জায়গা' (১৩৯৩), 'হৃদয়পুর' 'কিন্নরকিন্নরী' (১৩৮৪), উপন্যাসগুলোর অথবা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'জঙ্গলের দিনরাত্রি' (১৯৮৮) উপন্যাসটির প্রতিটি পৃষ্ঠা।

অজ পরিতাপ বোধ হয় এই জন্যে যে, কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে এ যাবৎকাল বাংলা ভাষায় মাত্র একটি বইই বেরিয়েছে: 'শক্তি চট্টোপাধ্যায় কাব্য পরিক্রমা', ড: সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, শিবরাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৯। এ এমন একখানি কেতাব, সারা কলেজ স্ট্রিট হাউজে গত এক যুগের বই জোগানদার অরুণা প্রকাশনীর শ্রদ্ধেয় বিকাশ বাগচীও হদ্দ হন যা না মেলাতে পেরে। শেষে এক ভারত সফরের ঠিক অন্ত্যমুহূর্তে (২৯.১০.৯৩-এ) বনগাঁ লোকালে চড়ার সময় শিয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে রেলওয়ে বুকস্টলে তসলিমার পাইরেটেড 'লজ্জা'র পাশে অধোমুখে শোভা পেতে দেখি এই ফ্যাকাশে সবুজ কভারের বইটিকে। এ এমন একখানি অভিসন্দর্ভ, যার ২২০ পৃষ্ঠার কলেবরে আপনার অন্ধের হস্তীদর্শনের সুকৃতি জুটবে, জুটবে না শুধু শক্তির কবিতার একছটাকও মননশীল ও তাত্ত্বিক উদ্‌ঘাটন। অথচ কী নেই এ গন্ধমাদনে! ১৬ পৃষ্ঠাব্যাপী 'ভূমিকা'র ১৫ পৃষ্ঠা জুড়ে শিল্পবিপ্লব, ''Illusion and Reaility (Chritopher Candrall"),''টি এস, এলিয়েট', "Notes towords the defination of Culture", কে. কে. দাশগুপ্তের 'Modernity And Contemporary Bengali Culure', শেলী, 'মালার্মে', হিন্দি লেখক নিরালা, এলডার, Static Art আবু সয়ীদ আইয়ুবের 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ','বন্দীর বন্দনা'; 'অর্কেস্ট্রা', 'ওডেন', স্পেন্ডার, নলিনীকান্ত গুপ্ত, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কীটস, 'পুনশ্চ', 'পলাতকা', প্রাবন্ধিক মানসমুকুল দাস, I. A. Richards, 'বদ্‌লেয়র' (ডবল ইনভার্টেড কমা ও নিম্নরেখাচিত্র দিয়ে ড: সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের বানানবিকৃতি বোঝানোর চেষ্টা করা গেল); প্রায় এক অধ্যায়েই গোটা বিশ্বরূপদর্শন। এবং এই ১৬ পৃষ্ঠার 'ভূমিকা' বাখামোর কেবল শেষ পৃষ্ঠাটিতে 'যাহোক, ...' দিয়ে শুরু করেও অবার ৭ লাইন ধরে গ্রন্থরচনার পশ্চাদ্বর্তী গুরু 'আচার্য'দের স্তুতিবাচনের পর স্রেফ 'শক্তি চট্টোপাধ্যায় বাংলা কবিতায় শিরোভূষণ' —এই একটি মাত্র বেদবাক্যেই শক্তি প্রয়োগ খতম করে দিয়ে লেখক আবার ঋণভার লাঘবের দায়িত্ব পালনের বাকি পৃষ্ঠাটুকুও সাবাড় করে ফেলেছেন। এস এম কলেজের (মতিহারি) এই ড: সোমনাথ মুখোপাধ্যায় নামীয় অধ্যাপকপুংগবের বটি নিয়ে এত বিস্তারিত ব্যবচ্ছেদের কারণ এর বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। ১৬ পৃষ্ঠার ভূমিকা, ১৯২ পৃষ্ঠার টেক্সট, ১৩ পৃষ্ঠার 'সূত্র নির্দেশিকা৪ (৩৪০টা উল্লেখসহ)...শ্রদ্ধাজাগরূক নয় কি: অধিকন্তু, ভারতীয় মুদ্রা ৪০ টাকায় লভ্য; লোভনীয় তো বটেই। অথচ এতে না আছে সঠিক মূল্যায়ন, না আছে প্রকৃত রসোদ্ধার;...কবিতার অর্থ না বুঝে আগড়াম্‌বাগড়ম্‌ই সার, এমন কীরচনা পরিকল্পনারও বালাই নেই। আলোচনার নমুনা দেখুন:

ক। ''শক্তি চট্টোপাধ্যায় আধুনিক বাংলা কবিতার একটি বিশিষ্ট স্তম্প; এই নাম নিঃসন্দেহে স্বীয় জয়ধ্বজা স্বয়ং বহন করে।" (বইয়ের সূত্রপাত বাক্য)

খ। ''সে যাই হোক, শক্তি চট্টোপাধ্যায় বাংলা কাব্যে যেজন্য অধিক চিহ্নিত সেটা তাঁর শব্দচয়ন ও ভাষা প্রয়োগ। বিচ্ছিন্নতাবোধ যেমন সেখানে আছে, নিঃসঙ্গ আলাপও সেখানে বিরল নয়।" (পৃ.১৮)

গ। ''কবিতাকে দুরূহতম, শিল্পমাধ্যম রূপে চিহ্নিত করতেই পঞ্চাশের দুই কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় স্বকীয় পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন।" (পৃ. ২৯)

ঘ। ''শক্তির প্রেমের কবিতার মধ্যে নোনা জলের ভাবুকতা নেই..." (পৃ. ৪১)

ঙ। ''অল্পের জন্য কবি সনেট রচনা করেন নি,..." (পৃ. ৯৬)

দুশো পৃষ্ঠার বইয়ের দেড়শোটি পৃষ্ঠাই উদ্ধৃতির রাহুগ্রাসে খেয়েছে। তবে রক্ষে, ২০৭ পৃষ্ঠায় এসে সদয় লেখক 'বিগত ২৫-৩-১৯৮৫ থেকে ২৮-৩-১৯৮৫ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুশ্রী কমিশনের অর্থানুকূল্যে, বিহার বিশ্ববিদ্যালয় মজঃফরপুরের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত ত্রিদিবসীয় সেমিনারে 'রবীন্দ্রনাথ ও স্বাধীনতাউত্তর বাংলা কবিতা' ''অনুষ্ঠানে'' ডঃ মঞ্জুলী ঘোষ, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর মৈত্র, অমিতাভ দাশগুপ্ত, দেবকুমার বসু, ডঃ অজিত কুমার ঘোষ, ডঃ প্রশান্ত কুমার পাল (সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য, স্বয়ং কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় এই সারস্বত অ্যারেনাতে অনুপস্থিত। প্রমুখ বৃধব্যাঘ্রমণ্ডলী সমক্ষে উপস্থাপিত এই মুদ্রিত ভাষণটির ক্ষান্তি টেনেছেন 'অলমিতি' বলে মনে মনে শাস্ত্রবাক্য আওড়াই, শতংবদ মা লিখ। আমারও এই একটানা বাক্যব্যয়ের কারণ, ৪০টি মূল্যবান ভারতীয় মুদ্রাব্যয় ও বইটি হাতাতে গিয়ে ট্রেনফেল। গত ৬.৯.৯৪-এ শক্তির বাড়ি বসে

কথাচ্ছলে বলেছিলাম; বইটা পড়েছ নিশ্চয়। সেয়ানা সারল্যের হাসি দিয়ে শক্তি পাল্টা প্রশ্ন করে: লিখেছে নাকি? কে ওটা?

চার

বহু পরে ৫ই জুলাই ১৯৮৪-এর সন্ধ্যেয় কর্নেল বিশ্বাস রোডের বাড়িতে বসে আড্ডা দেবার সময় শক্তি হঠাৎ জিজ্ঞেসা করে বসে, আচ্ছা জন্মটা কবে হে?

১৯৩৪।
বাঃ! মিলে গেল।
তোমার?
ওই ১৯৩৪। কী মাস?
আগস্ট। তোমার?
আরেকটু পিছিয়ে। নভেম্বর। বিয়ে করলে কবে?
১৯৬৭।
বা! বা! আমারো সিক্সটিসেভেন। কী মাস?
এপ্রিল।
হল না। আমার আগস্টে। কোথায় বিয়ে করেছ?
কেন: বাংলাদেশে।
বেশ তো, কোন দিকটায়?
আমাদের বাড়ি যেখানে বাগেরহাটে।
আরে দাঁড়াও দাঁড়াও! এটাও মিলে যাচ্ছে।
আমি অবিশ্বাসী চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকি তার দিকে।

পরে জানতে পারি, শক্তির বউ মীনাক্ষী আমাদের বাগেরহাটির দশানী গ্রামের বিশ্বাসবাড়ির মেয়ে। তবে তাঁদের ফ্যামিলি অনেক আগে থেকে কলকাতায় সেট্‌লড। মীনাক্ষীর সঙ্গে পরে আমার আরো নৈকট্য গড়ে ওঠে নারায়ণের (নাড়ু)র সূত্রে। ওরা দুই বাগেরহাটি একই অফিসে চাকরি করে। শক্তির মূল বাড়ি কলকাতা থেকে ২৮ মাইল দূরে বহড়ু গ্রামে। বাল্যকাল কাটে গ্রামের বাড়িতে। চার বছর বয়সে পিতৃহারা হন। মানুষ হতে থাকেন দাদামশাই ডা: সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। পনেরো বছর বয়সে মায়ের সঙ্গে বাগবাজারে মামাদের বাড়িতে চলে আসেন। ক্লাশ এইটে উঠে ১৯৪৮-এ ভর্তি হন কাশিমবাজার পলিটেকনিক স্কুলে। এই সময়ে ভূগোলের মাস্টারমশাই হরিপদ কুশারীর প্রভাবে মার্কসবাদী রাজনীতিতে ঝোঁকেন। ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ নিয়ে পাশ করার পর প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। তখন তিনি পরিণত হন বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের অগ্রগামী সংগঠকে। বন্ধু দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্জুন সেনগুপ্ত ও জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে তিনি ১৯৫১-৫২-তে কলেজ ছাত্র ফেডারেশনের শাখা গঠন করেন। এভাবেই চলে আসেন কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে। কিন্তু ১৯৫৮-তে রাজনীতি একেবারে ছেড়ে দেন।

১৯৫১-তে ম্যাট্রিক টেস্ট পরীক্ষায় প্রথম হবার খবর জেনে খুশিতে জীবনে প্রথম মদ্যপান করেন। একবার পর পর চারদিন স্রেফ মদ খেয়ে কাটিয়ে দেন।

তাঁর প্রথম কবিতা বের হয় ১৯৮৪-এ। তখন বাগবাজারের বাড়ির থেকে শক্তির নেতৃত্বে হাতে লেখা পত্রিকা 'প্রগতি' বেরুতো। পরে নাম পালটে হয় 'নবোদয়'। এতে শক্তি লিখতেন 'স্ফুলিঙ্গ সমাদ্দার' ছদ্মনামে। তবে তাঁর প্রথম দিকের লেখা থেকে প্রকাশিত 'বহ্নিশিখা' পত্রিকায় ৩য় বর্ষের ২য় সংখ্যায় (১৯৫৯ সালের পৌষ; ১৯৫২খ্রি:) একই সঙ্গে শক্তির দুটি কবিতা ছাপা হয়। প্রথম কবিতার নাম 'অস্ফুট যৌবনাকে'। কবির নাম শ্রীশক্তি চট্টোপাধ্যায়। দ্বিতীয় কবিতার নাম 'পথের ধারের কোন মেয়েকে'। কবির নাম স্ফুলিঙ্গ সমাদ্দার। দুটো প্রাথমিক স্তরের কাঁচা কবিতা। তাঁর প্রথম পরিণত সৃষ্টি হিসেবে উল্লিখিত কবিতার নাম 'যম'।

শক্তির প্রথম কবিতার বই 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' (ফাল্গুন ১৩৬৭; ১৯৬০ খ্রি:)। প্রথম উপন্যাস 'কুয়োতলা' (১৯৬১; তবে তার আগে 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় প্রকাশিত)।

কবিতার সংখ্যা আড়াই হাজারের মত। বইয়ের সখ্যো আনুমানিক ৭১। লেখায় আয়ু ৪১ বছর। বন্ধুরা তাঁর শ্রেষ্ঠ চারটে কাব্যগ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন, যথাক্রমে: 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য','সোনার মাছি খুন করেছি','চতুর্থপদী কবিতাবল' ও 'প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই'।

পেশার ক্ষেত্রেও শক্তি বোহেমিয়ান। শিল্পীবন্ধু পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে একবার বৈঠকখানা রোডে জনাআশি

ছেলেমেয়ে জুটিয়ে কোচিং সেন্টার খোলেন। ওদের টানে সেখানে বিনয় মজুমদার, বাসুদেব দাশগুপ্ত, ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায় অরূপরতন বসু, অমলেন্দু চক্রবর্তী প্রমুখ লেখকও জোটেন। পরে অবশ্য 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র চাকরিতে থিতু হয়ে যান।

হাংরি জেনারেশনের সঙ্গে ক্ষণকালীন ও 'কৃত্তিবাস' পত্রিকাকেন্দ্রিক কবিগোষ্ঠীর সঙ্গে চিরকালীন বন্ধনে সম্পর্কিত। একসময় 'কবিতাসাপ্তাহিকা'র সম্পাদনা ও প্রকাশনা নিয়ে প্রচণ্ড ভাবে মেতে ওঠে। তখন আড্ডা সমাতেন ২০১ মুক্তারামবাবু স্ট্রিটে— সেই বিখ্যাত কথাশিল্পী রমেশচন্দ্র সেনের বাসস্থান ও সাহিত্যসেবক সমিতির কার্যালয়ে। আমেরিকার বিট কবিপ্রধান অ্যালেন গিন্‌স্‌বার্গ কলকাতায় এলেন তাঁর সঙ্গে শক্তির গাঢ় সখ্যাত গড়ে ওঠে। প্রচণ্ড ভ্রমণবিলাসী এই কবি। ১৯৯৫-তে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র চাকরি থেকে অবসর নেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে শান্তিনিকেতনের বাংলা বিভাগে শক্তি-সুনীল-শরৎ তিন কবিবন্ধু মিলে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে যোগ দেন। এ সময় 'বিনোদন' পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে সাময়িকভাবে যুক্ত থাকেন শক্তি। এ ছাড়া, গীতা ও ব্লেকের কবিতার অনুবাদ এবং আত্মজীবনী নিয়ে কাজ শুরু করেন। মৃত্যুর মাত্র কয়েক দিন আগে 'কৃত্তিবাসে'র পুনঃপ্রকাশ ঘটানোর জন্যে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

বাংলা সাহিত্যে শুধু কবি হিসেবে খ্যাত অথচ একাধিক মৌলিক উপন্যাসের রচয়িতা, এরকম তিন কবি একজন শক্তি চট্টোপাধ্যায়; অন্য দুই কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও জীবনানন্দ দাশ।

শক্তি তিনজন কবিকে পর্যায়ক্রমে গুরু মেনেছেন। চিত্রগুণ ও রোমান্টিকতার জন্যে আনন্দ বাগচী। ছন্দ, শব্দ নির্বাচন ও শৈলীর জন্যে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। পরাজাগতিক মন্ত্রমুগ্ধতার জন্যে জীবনানন্দ দাশ। আর তাঁর কবিতায় রিলকে, বোদলেয়ার, হিমনেথ, ডিলান টমাস, অ্যালেন গিন্‌স্‌বাগ প্রমুখ বিদেশী কবির আলোছায়া বার বার আসা যাওয়া করেছে। আর, সব কিছু ছাপিয়ে মৌলিক ভাষা ও ভাবজগৎ নিয়ে অনন্য স্বাতন্ত্র্যে মাথা ছাড়িয়ে ওঠেন যে কবি, তিনি শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

নিজের কবিতাকে বলতেন 'পদ্য'। তাঁর সবচেয়ে বেশি প্রচারিত কবিতা 'অবনী বাড়ি আছো'। সবচেয়ে জনপ্রিয় কবিতা 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো?' এই নামের কাব্যের জন্যে কবি ১৯৮২-তে একাডেমি পুরস্কার পান।

প্রচণ্ড ভালবাসতেন রবীন্দ্রসংগীত— গাইতেনও সুন্দর। বহু গান মুখস্থ ছিল।

তাঁর শেষ কবিতাপাঠ ১৯শ মার্চ ১৯৯৫ রোববার সন্ধ্যের পর, মৃত্যুর মাত্র চারদিন আগে বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সেদিন দৈবানুপ্রাণিত কণ্ঠে একটানে গোটা বিশেক কবিতা পড়ে যান শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

ওই দিনই তিনি বন্ধু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে বলেন, আরো তো অনেক বছর বাঁচবো। আরও ওই দিনই অর্থাৎ মৃত্যুর চারদিন আগে কবিতাপাঠের আসন থেকে বেরিয়ে এসে দোতলার সিঁড়ি ভাঙতে গিয়ে বুকে চাপ বোধ করেন। হাঁপ ধরে যায় হাসতে হাসতে বন্ধু সুনীলকে বলেন, নাঃ আমার ও সব কিছু হয় না। হার্ট-ফার্ট সব ভাল আছে। কিন্তু কিছুদিন আগে যদিও চেয়েছিলেন শরীর থরো চেকআপ করিয়ে নিতে। আলসেমির দরুন হয়ে ওঠেনি।

২৩শে মার্চ ১৯৯৫ বৃহস্পতিবার ভোর ৫টায় তাঁর মৃত্যু হৃদরোগে।

শক্তি তাঁর জীবদ্দশায় বিচিত্র বাউন্ডুলে জীবনযাপনের জন্যে কিংবদন্তি হয়ে ওঠেন। তুমুল কবিখ্যাতি ও জনপ্রিয়তা জোটে। অসংখ্য ভক্ত তৈরি হয়। অনেক পুরস্কার পান। তবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার থেকে কোনো পুরস্কার আসেনি। আবার, মৃত্যুর পর এই সরকার রাজকীয় সম্মান দিয়ে কবির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন। প্যাথসটি এই, শেষের দিনগুলোতে নব্য কবি ও কবিভাবাপন্নদের কাছ থেকে একরকমের উপেক্ষা ও অবহেলা পেতে হয়েছে কবিকে। কবি জয়দেব বসুর বিবৃতিতে : ''শেষবার যখন হলদিয়া গেছিলেন কবিতা পড়তে, তখন দেখেছি মঞ্চের পিছনে একটি সোফায় বসে ঝিমোচ্ছেন। একা। দুই হা...না, হাত নয়, দীর্ঘ দুই ডানা দুপাশে ছড়িয়ে। আর, তাঁর থেকে চার-পাঁচ গজের মধ্যেই চলছে তথাকথিত তরুণ-তরুণীদের সোল্লাস কানাকানি ও পরচর্চা। তাঁর পরিচর্যা তো দূরস্থান, ন্যূনতম খবরাখবর নেওয়ার প্রয়োজনও কেউ বোধ করেনি।''

যদিও শেষ দিকে তাঁর লেখনির ধার ও ভার কমে এসেছিল, তবু একটা নতুন বোধের জাগরণ ঘটেছিল এই বেলাতেই। অন্তিমে এসে আরো একবার তীব্র ভাবে জ্বলে উঠতে চেয়েছিলেন কবি।

পাঁচ

কৃত্তিবাসগোষ্ঠীর লেখক ও শিল্পীরা : শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়, দীপক মজুমদার, তারাপদ রায়, বেলাল চৌধুরী (বাংলাদেশ), সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়,

বিনয় মজুমদার, সুনীল বসু, শিবশম্ভু পাল, মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সবাই বোহেমিয়ান যাযাবর স্বভাবের রাগি যুবক। যৌবনের রাগধর্মে সর্বপ্রকার প্রতিষ্ঠানিকতার লাল ফিতে টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফুৎকার দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলেন এঁরা সেই ষাটের দশকে। কফি-মদঃবিড়ি-চার্মিনারে গুলজার করে রাখতেন কলকাতার কফিহাউস, শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়, খালিসিটোলা, পার্ক স্ট্রিট ও পত্রিকার অফিস। মধ্যরাতের কলকাতা শাসন করত চারজন রাগি যুবক। মধ্যরাতে বাড়ি ফেরার পথে টলমল পায়ে ফুটপাত বদল হয়ে যেত। আপ্যায়নের দায় নিত পুলিশের লগুড়। শক্তি-সুনীল-দীপক-শরৎ-বেলালের একটি প্রমত্ত গ্রুপ। জব চার্নকে ভিত গাড়া এলিট কলকাতা পারেনি আঁটাতে তাদের মত্ত বোহেমিয়ানাকে, ছুটে বেরিয়ে গেছে নিসর্গের আদিম ও মৌলিক শিকড়সন্ধানে। ঝাড়গ্রাম...হেসিডি...চাঁইবাসা...বেথুয়াডহরি...দিশেরগড়...ডালটনগঞ্জ...ডাকবাংলো, রেস্টহাউস, বন্ধুনিলয়, আদিবাসী গ্রাম - জঙ্গল চষে ফিরেছে তারা। ১৯৬০ তথা ১৯৬২ থেকে ১৯৬৬ এই ছ-সাতটি বছর অর্থাৎ শক্তির জীবনের ২৭ থেকে ৩৪ বছর বয়সের এই দূরন্ত বাউন্ডুলেপনার কালটি ছিল কবিতা ফলসের বাম্বার পিরিয়ড। ঘোরের মধ্যে থেকে দিনে সাত/ আটটি কবিতা লিখে গেছেন তিনি। শক্তি নিজে বলেন, কী করে যে লিখেছি—যেন ম্যাজিকের মতো শব্দ। উন্মাদের মতো লিখে গেছি।

সকালের একটি লম্বা সময় কাটিয়ে দিতেন শ্যামবাজারে কফিহাউসে আড্ডা দিয়ে, এখন সেখানে হরলালকার কাপড়ের দোকান। রাত বারোটার দিকে শ্যামবাজারের মোড়ে কার্তিকের দোকানে ঢুকে প্রত্যেকে আউন্স দশেক করে চোলাই চালানো। সেই সঙ্গে গোলবাড়ির নীচে রুটি আর কষামাংস (শক্তির স্পেশাল ফেভারিট)। তারপর আন্ডারউইয়ার পরা শক্তিতে বনাম শরতে সেই কড়া শীতের রাত বারোটায় মল্লযুদ্ধের পাঁয়তারা করতে করতে যার যার উরুথাবড়ানি। হঠাৎ বাড়ি ফেরা খেয়াল হতে ট্যাক্সির খোঁজ। ট্যাক্সি মিলল তো মাতাল দেখে ড্রাইভার বিগড়ে বসল। সুনীলের থাপ্পড় খেয়ে ড্রাইভার ট্যাক্সি নিয়ে ভাগলবা। খানিক পরে গুন্ডাসহ ফিরে এসে গোটা কবি গ্রুপকে রামধোলাই। মার খেয়ে ছুটে গিয়ে এক বাড়ির দেয়াল টপকে ভিতরে ঢুকে পড়ে শক্তি। বাড়িওয়ালা ওর কালো দাড়ি দেখে চোর ঠাউরে বারান্দায় থামে বেঁধে বেদম পিটুনি দেয়।

কুলগাছিয়া ডাকবাংলোতে জানালা দিয়ে ডানা মেলে আকাশে উড়তে গিয়ে নীচের টিলার উপর মুখ থুবড়ে পড়ে যায় শক্তি। হাত ভেঙে গেল। বন্ধুরা কলকাতায় ফিরে পি.জি-তে ভর্তি করে দেয়। একবার ওরই পাগলামোর জন্যে এক সাঁওতালবাড়িতে নির্ঘাত মারা পড়তে গিয়ে কোনোমতে বেঁচে ফিরে আসে সঙ্গীরা।

শক্তির এই বাউন্ডুলেপনার মধ্যে একটা প্রচণ্ড পরম ভায়োলেন্স ও জেদের প্রবণতা কাজ করত। ছেলেবেলা থেকে জীবনভর বহু আঘাত ও অপদস্থতা সইতে হয়েছে তাকে। হয়তো তারই প্রতিক্রিয়া এ সব। বাচ্চাবয়সে টাকাপয়সার টানাটানি গেছে চথেষ্ট। পায়ের উপর দিয়ে রিকশার চাকা চলে গেছে। হাতঘড়ি কখনো হারিয়েছে, কখনো ভেঙে গেছে, কখনো ছিনতাই হয়ে গেছে। অফিসে পেডস্টাল ফ্যানের ব্লেডে লেগে আঙুল থেঁথলে গেছে। একবার ময়ূরভঞ্জে চলে যায়, কনুইতে গরম প্রেসারকুকারের পোড়া ঘা, কপালে ব্যান্ডেজ; —এই দশা নিয়ে। মারপিট করে চশমার কাচ ভেঙেছে, ঘুষি খেয়ে চোখ ফুলিয়েছে, কপালে পট্টি নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। ১৯৪৮-এ ইলেকট্রিক সকেটের মধ্যে তার ঢুকিয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। অল্পের জন্যে বেঁচে যায়। গাড়িঘোড়া - মুখর ব্যস্ত রাস্তার মধ্যিখানে দিয়ে নিরুদ্বেগ উদাসীনতায় ছুটে পার হয়ে গেছে। ট্যাক্সিট্রাম থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে বেকুবের কথায় মেরে বসেছে। তাক করে জলন্ত দেশলাই কাঠি ছুড়ে মেরেছে। মজার চোটে ঘুসি বসিয়ে দিয়েছে বন্ধুকে। পার্ক হোটেলে অমিতাভ দাশগুপ্তের ধুতিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ হঠাৎ খেপে গিয়ে ভয়ংকর উত্তেজিত হয়ে উঠত। বান্ধবী রুচিরা শ্যামাকে চিঠিতে শক্তি লেখে : আমি সহজ স্বাভাবিক হব, এ যেন আমার ভাগ্যে লেখা নেই। খুব কাছ থেকে দেখতে পাওয়া মীনাক্ষী বলেন :ওর মধ্যে প্রচণ্ড একটা জেদ ছিল, জোর ছিল। সব কিছু যেন ভেঙেচুরে নতুন করে সৃষ্টি করতে চাইত। এই ভাঙার, ভেঙে গড়ার কাণ্ডটা আমরা কিন্তু শক্তির কবিতার মধ্যেও দেখেছি। অস্থির ও অতৃপ্ত আবিষ্কারকের মতো শব্দ-ছন্দ - বিষয়কে ভেঙেচুরে নিজের মতো করে গড়ে তুলছে চেয়েছেন এই বিদ্রোহী কবিমানুষটি।

বিয়ে করে থিতু হতে চাইলেও মজ্জাগত উড়ুক্কু স্বভাবটি ওকে মাটির বন্ধন থেকে সব সময় উড়িয়ে নিয়ে বেড়াত। সন্তানকে ভালবাসত অকৃত্রিম। অথচ কন্যা বাবুইকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে তাকে ফেলে রেখে কোথায় কিসের টানে উধাও হয়ে গেছে, খবর জানে না ঘরের মানুষরা। বাড়িতে বাচ্চার জ্বর চলছে। ওষুধ আনতে গিয়ে হারিয়ে গেল লোকটা। রাতে বাড়ি ফিরল না স্রেফ। বন্ধুকে খাবার নেমন্তন্ন করেছে দুপুরে বাড়িতে। কিন্তু খোদ গিন্নিকে বলে রাখতে ভুলে গেছে। (তবে এই অধমের ভাগ্যটি সেদিক দিয়ে ব্যতিক্রম বলে প্রমাণিত হয়েছে।) ১লা বৈশাখে শিল্পীবন্ধু পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়কে নেমন্তন্ন করেছিল চলতি বাসে ঝুলন্ত অবস্থা থেকে। নববর্ষের ভোর ভোর শক্তির দরজায় এসে তার ব্যাজার গৃহিণীর কাছ থেকে জানতে পান পৃথ্বীশ, গত সাত দিন ধরে শক্তি বাড়ি থেকে ফেরার। একদিন সকাল সাড়ে ছটায় দোরগোড়ায় জাঁকালো হাঁক শুনে মীনাক্ষী আগল খুলে দেখেন কাবুলিওলা খাঁ সাহেব

থলি নামিয়ে বসে আছে। জানা গেল, শক্তি আগের দিন তাকে পথে পেয়ে জপিয়েছে, দুজনে একসঙ্গে মিলে পেস্তা বাদাম হিং কিশমিশের ব্যবসা করবে। মীনাক্ষী এই মানুষটিকে 'স্বাভাবিক সামাজিক মানুষ' বলে ধরতেন না। শক্তি যে নিজেকে বলেছে 'সংসারী সন্ন্যাসী', 'অসামাজিক', 'রোমান্টিক বোহেমিয়ান'; এ সবই নির্জলা সত্যি কথা।

কেউ বলেন, শক্তি এই বাউন্ডুলেপনা আসলে বাস্তব থেকে অবিশ্রান্তভাবে দূরে চলে যেতে চাওয়ার আর্তি থেকে। আর শরৎ, মীণাক্ষী ও আরো অনেকে বলেন, শক্তির যত কিছু উচ্ছৃঙ্খলতা ও অশান্তি-অস্থিরতা, সবই তো কবিতার জন্যে। মনে হয়, এ সব তথ্য পার্টলি ট্রু অব এ হোল ট্রুথ। হয়তো শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মূল ব্যক্তিস্বভাবের গঠনটাই ছিল বোহেমিয়ান উপাদানসর্বস্ব। তার ব্যক্তিগত আচরণ ও লেখালেখি, দুটো দিক ছিল ওই বোহেমিয়ান প্রবণতারই দুরকম বহিঃপ্রকাশ। যে কারণে সে ও তার কবিতা, দুটো ব্যাপারই ছিল সম্পূর্ণ দলছুট ও প্রথাবিরোধী প্রতিভার নিদর্শন। চেনা মাপের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার আয়ত্তাতীত।

আবার, প্রচলিত অর্থে শক্তি চট্টোপাধ্যায় নিহিলিস্ট, নৈরাজ্যবাদী ও নাস্তিক ছিল কি না, সে সব প্রশ্ন বার বার উঠেছে এবং এখন মৃত্যুর পর আখেরি মূল্যায়নের টানে আরও বেশি করে উঠতে থাকবে। একটি কথায়ই এ সব সংশয়ের সদুত্তর হয়ে যায়: শক্তি অবিশ্বাসী ছিল না, ছিল প্রচণ্ড রকম প্রেমিক, যাকে বলেন প্যাশনেট লাভার। যা এবং যাকে ভালোবাসত, পুরো সত্তাযোগে তীব্রভাবে ভালোবাসত। প্রেম, প্রেমিকা, সন্তান, স্ত্রী, সংসার, বন্ধু, সংগীত, মদ, আড্ডা, ভ্রমণ, কবিতা, সুন্দর প্রকৃতি, স্বাধীনতা; —এই সব প্রিয় প্রসঙ্গে জীবন বাজি ছিল ওর। রাখঢাকের ভণ্ডামিটা করতে জানত না ও প্রথাপ্রতিষ্ঠিত গুরু ও ওঁচা ফসিলের বিরুদ্ধে। এর সঙ্গে স্যাডিস্টের ধর্ষকামকে গুলিয়ে ফেললে কিন্তু 'কিন্তু কেন যাবো?','সন্তানের মুখ ধরে একটা চুমো খাবো', 'তোমাদেরো সঙ্গে নিয়ে যাবো। একাকী যাবো না অসময়ে' ...এই সব আর্তস্বর একেবারেই নীরক্ত ও মেকি হয়ে যায়।

শক্তি ঈশ্বরকে ওর মতো করে বিশ্বাস করত। বান্ধবী রুচিরা শ্যামকে লেখা চিঠিতে ওর টিপিক্যাল উক্তি: আমি বিপদে পড়লে ওই পারাপারের অতীত প্রভূটিকে খোঁজ - তালাশ করে থাকি।

সব চেয়ে বড় কথা, ও ভয়ংকর রকম ভালোবাসত। নিজেকে। নিজেকে এত বেশি ভালবাসত যে একা থাকতে প্রচণ্ড ভয় পেত। এমনকি, ভূতকেও ভয় পেত। মৃত্যুর পর দুর্মর টান, কিন্তু সেই মৃত্যুকেও ভীষণ ভয় করত। শক্তি ও পেগানসেলফ্ একীভূত হলে যা হয় আর কী। প্রিয়জনের মৃত্যুতে দারুণ কষ্ট পেত। ওর লেখা গুচ্ছ গুচ্ছ এলিজি কবিতাই (অর্থশত তো হবেই) তার প্রমাণ। প্রিয় মানুষ মরে গেলে মনের দুঃখে একটু বেশি করে মদ খেত। জ্বলন্ত চিতার দৃশ্য ও মানুষ পোড়ার গন্ধ ও সহ্য করতে পারত না। তবু একটা অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল মৃত্যুর প্রতি। দল বেঁধে নিমতলা শ্মশানে যেত মৃত্যুর দৃশ্য দেখতে। যেত নিশ্চয় অবচেতনার রোমান্টিক তাড়নায়।

কী প্রচণ্ডই না ও মানুষকে ভালবাসতে পারত! কত সহজে মানুষকে বন্ধু বানিয়ে ফেলত! লেখক, ইঞ্জিনিয়ার, পানের দোকানদার, রিকশাওয়ালা, বয়োজ্যেষ্ঠ, বয়োকনিষ্ঠ; সবাই ওকে ভালবেসে ফেলত। কেমন অনায়াসে ও তাদের 'তুমি', 'তুই' বলতে পারত! কোনো নীচতা বা ক্ষুদ্রতা একে ছুঁতে পারত না। খুব বড়সড় খারাপ কিছু কেউ করলে বলত: 'ছোটোলোক', 'উল্লুক', 'একেবারেই নষ্ট'। আবার তার সঙ্গে দেখা হলেই আগ বাড়িয়ে আলাপ, কী? ভাল আছো তো? খবর কী? রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইত সবটুকু দরদ দিয়ে। বিয়ের আগে একদিন মহম্মদ আলি পার্কে বসে চারবান্ধবী মীনাক্ষী-রুচিরা-কৃষ্ণা-প্রণতিকে রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে শোনাচ্ছে। 'ওগো কাঙাল আমাকে কাঙাল করেছো', গাইতে গাইতে কান্নায় ভেঙে পড়ে শক্তি।

'আনন্দ ভৈববী' কবিতার ঘটকালীতে প্রেম যেদিন মীনাক্ষীর মূর্তি - প্রতিমা ধরে এল শক্তি জীবনে, তখন তাকে যোগ্য নৈবেদ্য দান করতে কোনো কার্পণ্য করেনি সে। পশ্ কলকাতার আধুনিক সমাজে আধুনিক যুগে সত্যিকার অর্থেই গান্ধর্ব বিবাহ প্রক্রিয়ায় দয়িতাকে বরণ করে নেয়। শক্তির একটি অজানাপ্রায় বইয়ের খোঁজ আমরা অনেকে রাখি না। নাম 'লুসি আর্মানীর হৃদয়রহস্য', — উৎসর্গিত মীনাক্ষীকে।

এত বড় আস্তিক কবিকে 'অবিশ্বাসী'র গাড্ডায় ঠেলে দেওয়ার মতো অমানবিক ও অবোধ আচরণ আর কী হতে পারে? মৃত্যুর আগেও এই কবি চেয়ে গেছেন সন্তানের গালে চুমো এঁকে রেখে দিতে। 'আমি জীবনে কাউকে ঠকাইনি'—এই প্রেমময় স্বীকারোক্তি শক্তি করেছেন রুচিরা শ্যামকে লেখা একটি চিঠিতে। কখনও ভোলা সম্ভব নয় শক্তির অমর প্রেমলিপি: 'মানষ বড় কাঁদছে— তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও।'

ছয়

১৯৬৩-তে কলকাতা থেকে ফেরার পর শক্তির সঙ্গে আমার টানা প্রায় এক যুগের অদর্শন। সম্পর্কটুকু রয়েছে জীয়নো। চিঠিপত্র চলে। তার মধ্যে স্মরণীয় আমার মায়ের মৃত্যুতে লেখা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের চিঠিটা। সবই খোয়া গেছে একাত্তরের মহাবিপর্যয়ে বার বার শহর-গ্রামে হিজরতের টানাপোড়েন। তবে নাড়ুর চিঠি আসে নিয়মিত

ও লম্বা লম্বা। আমার সেই ঘটনাবলীটুকুর অছিলা ছুঁয়ে ধীরে ধীরে নিজের বিকাশে ও অধ্যবসায়ে একদিনে সেও একজন পুরো লেখক; তবে শক্তি-সুনীলের তাঁবুর বাইরে কমিটেড বামপন্থী লেখক। ওর চিঠিতেই কফিহাউসের কবিদের খবরাখবর পাই। আর 'কৃত্তিবাস' আসে। কবিতা একটি - দুটি ছাপা হয়। একদিন একটা শক্ত প্যাকেট এসে পড়ে। খুলে দেখি কবিতার বই। নাম 'বিষুব রেখায় যে নদী'। লেখক নারায়ণ মুখোপাধ্যায়। উৎসর্গ আবুবকর সিদ্দিককে।

সরাসরি ১৯৭৪ -এ চলে আসবো এবার। অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশে। তখনো দেশেই বাগেরহাটে এপিসি কলেজে আছি আমি। তবে একমাসের নোটিশ পিরিয়ড কবার করার জন্যে দিন গুনছি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে সিলেকশন হয়ে গেছে। ৭ই মার্চ জয়েন করবো। মাস ফেব্রুয়ারী। বাংলা একাডেমী আয়োজিত একুশের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের কবিতার রাজনৈতিক পটভূমি বিষয়ে আমার মূল প্রবন্ধ পড়বার আমন্ত্রণ। তখন মহাপরিচালক ডঃ মাযহারুল ইসলাম। কবি বিষ্ণু দে'র চিঠিসূত্র সিকদার আমিনুল হক আমার কাছের মানুষ। ঢাকায় গিয়ে সোজা তাঁর বাসায় উঠি। বিশে ফেব্রুয়ারী। রাত দশটার দিকে ভিতরের কামরায় বিছানায় আধশোয়া হয়ে বই পড়ছি। হঠাৎ সিকদার আমাকে ড্রয়িং রুমে ডেকে নিয়ে এলেন। ভিতরে ঢুকে দেখি পাঁচ-ছজন মানুষ। আমাদের দেশী সাহিত্যিকদের মধ্যে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, শেখ আবদুর রহমান ও আবুল হাসান। প্রত্যেকেরই বেশ টলমল অবস্থা। অন্য তিনজনকেও আস্তে আস্তে চিনতে পারছি। মানে, ঠিক এগারো বছর পর শক্তি, সুনীল ও দীপকের চেহারা শনাক্ত করে নিতে পারি আমি। তবে শক্তিকে চেনা কষ্টসাধ্য। তার সে কালো চাপদাড়ি ঝাঁকড়াচুল অদৃশ্য। আস্ত গোলগাল মাথায় বিরল পাকা কেশ। পাকা গোঁপ। এই পাকা ধরা রঙটি অবিশ্রিত নয়, অমরেশ বিশ্বাসেরভাষায় হলুদ গরদ রঙের। হলুদফর্শা মুখে গলায় চিবুকে বয়েস ঝুলন্ত। কতকটা শেঠ মার্কা মেড়োর মত লাগছে। মাথায় একটা গান্ধীটুপী চড়ালেই হল। সুনীলের সঙ্গে অবশ্য দুবছর আগে ১৯৭২-এর আগে ২৫শে জানুয়ারী যশোরের সাগরদাঁড়িতে মধুমেলায় দেখা হয়েছে আমার। কথাচ্ছলে নাড়ুর প্রসঙ্গ তুলে শক্তি খেদ করে বলল, বুঝলে? নারায়ণ তো নকশাল হয়ে গেল। আর কোনো যোগাযোগ রাখে না। চমৎকার লিখছিল। হঠাৎ করে শেখ আবদুর রহমান চোখা চোখা গাল দিতে শুরু করলেন আমাকে। সেসব ব্রাত্যজনের ব্যবহার্য ও প্রাপ্য প্রাকৃত শব্দে আমার যুগপৎ ঘর্ম, উষ্ণ শ্বাস ও কেশশিহরণ দেখা দিল। ফাঁকে ফাঁকে দুটো একটা শব্দ, যেমন 'ইন্ডিয়ান ম্যাগাজিন' সো মেনি অ্যামেরিকান বুকস', 'বোগাস' প্রভৃতি থেকে মনে পড়ে গেল ধোঁয়া ধোঁয়া; - ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইউসিস লাইব্রেরিতে চাকরিরত অবস্থায় আমাকে বেশ কিছু ইংরেজি বই ঐ লাইব্রেরী থেকে ডোনেশন দেন এই অস্বীকারে যে, আমি তাঁকে বাগেরহাটে ফিরে গিয়ে কলকাতার পত্রিকা পাঠিয়ে দেব। তখন এদেশে এখনকার মত সুলভ ছিল না কলকাতার বই ও পত্রপত্রিকা। অবশ্য, আমি আমার অঙ্গীকার রাখিনি বা ভুলে গেছি (ইচ্ছাকৃত হতে পারে, মনে নেই)। আবদুর রহমানের শব্দলাভ ক্রমাগত চড়ে যাচ্ছে দেখে সিকদার আমাকে তাড়াতাড়ি করে ভেতরকামরায় পাঠিয়ে দিলেন।

পরদিন একুশে ফেব্রুয়ারীর সকালে বাংলা একাডেমীর মঞ্চে কবিতা পাঠের আসর। মঞ্চে আসীন দেশের খ্যাত অখ্যাত বহু কবি। আর আছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমন্ত্রিত কবি হরপ্রসাদ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, দীপক মজুমদার প্রমুখ। শেষের তিনজনের চোখ লাল চুর অবস্থা। সুনীল ভোম হয়ে বসে আছেন একপাশে। শক্তি বসে বসেই টাল খাচ্ছে কবিতা পড়তে উঠে মাইকের ডান্ডা জাবড়িয়ে পতনদশা ঠেকানোর চেষ্টা। পাঠান্তে মাহারুল ইসলাম সাহেবের সহায়তায় আসেন পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

এই ঘটনার ঠিক সাড়ে দশ বছর পর শক্তির সঙ্গে আমার তৃতীয় দফা সাক্ষাৎ আর ততদিনে আমি তার কবিতা যাদুতে আনখচুল সম্মুগ্ধ। আদি পর্বের পাঁচটি কাব্য মোহিনীপাশে তো আগেই বেঁধে নিয়েছিল। এরপর একে একে 'চতুর্দশপদী পদাবলী', 'উড়ন্ত সিংহাসন', 'মানুষ বড় কাঁদছে', 'ভালোবেসে ধুলোয় নেমেছি',' মন্ত্রের মতন আছি স্থির','যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো','কোথাকার তরবারি কোথায় রেখেছে'...এই সহ অলৌকিক নামের কবিতার বই ও তাদের মধ্যেকার শব্দকুহক আমাকে আচ্ছন্ন করে নেয়। সে একটা মন্ত্রজালের ঘোর। শক্তিকে আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দুটো কবিতা লিখি এ সময়ে।

সাত

২.৪.৮৪-এর সকালবেলায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ১৯ নং কর্ণেল বিশ্বাস রোডের বাসায় এলাম অনেকদিন পর। সেই যে চুয়াত্তরে ঢাকায় দেখা, তারপর। সঙ্গে আমার বড় মেয়ে দীনা ওরফে বিদিশা। বাড়িতে ছিলেন শক্তি। আমাকে দেখে মহাখুশি। একেবারে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন ড্রইংরুমে। আমার মেয়ের নাম শুনে চমৎকৃত। চিবুক নেড়ে দিয়ে আদর করলেন। বললেন, বাবা কবি তো, তাই নাম বিদিশা। আমি বলি, না হে, আমি ডাকি দীনা বলে। আমার বাবা ওর নাম রেখেছেন পরভীন। আর ওর চার বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি হতে গিয়ে নিজেই নিজের নাম পাল্টে খাতায় তোলে বিদিশা।

অ্যাঞ বলো কী গো!

হ্যাঁ, আমার বাবা আমার যে নামটা রেখেছিলেন, তা পাল্টিয়ে আমি আর সাহস পেলাম না সাহিত্যিক নাম বানানোর। মেয়ে সেটা করেছে।

হ্যাঁ...? তুই তো বাপকে টপকে গেছিস, বাঃ! এই মীনাক্ষী-বাবুই - তাতার! সব এসো এদিকে। দ্যাখো কে এসেছে!

মীনাক্ষী এসে দাঁড়ালেন। পিছনে কন্যা ও পুত্র।

এদের কাউকে আমি দেখিনি। কারণ আমার কলকাতায় আগমন সেই তেষট্টির পর এই প্রথম। মীনাক্ষীর চেহারা একেবারেই বাঙালি গেরস্থ বধূর মত স্নিগ্ধ শান্তিময়ী। ভালো লাগল। শক্তির খরজ্বলা জীবনে শান্তির দরকার। নমস্কার করলেন। বললেন, আপনার অনেক গল্প শুনেছি।

সে কী! আপনি তো আমায় চেনেন না।

নারায়ণদার মুখে।
শক্তি যোগ করেন, ওরা দুজন একই অফিসের কোলীগ জানো?
মীনাক্ষী হেসে বলেন, রায়টের সময় আপনি নারায়ণদাদের বাগেরহাটের বাড়ি সারারাত ধরে পাহারা দিয়েছেন।
আমি লজ্জা পাই। বলি, ওঃ! সে সব তো বিশ - পঁচিশ বছর আগের কথা। ভুলেই গেছি।
মীনাক্ষী বিদিশাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করেন। নাম আবার বিজ্ঞেস করেন। আমার কাছে রফিক আজাদ ও অন্যদের কুশল প্রশ্ন করেন।
শক্তির ছেলেমেয়ে দুটি খুব মিষ্টি চেহারার। ভাল স্বাস্থ্য। মেয়ের মুখখানি লক্ষ্মীমতি। যাকে বলে বাপসোহাগী। নাম বাবু। তিতিও বলে। ছেলে ছোট। নাম তাতার।
শক্তি আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, জানো মীনাক্ষী? সিদ্দিক আমাকে সত্যিই ভালবাসে। ও বাংলাদেশের বইয়ে ওর প্রিয় কবির নাম বলতে আমার নাম দিয়ে দিয়েছে।
কোন বই? কোন্ বই? হ্যাঁ। মনে পড়ে যায়, চট্টগ্রাম থেকে শিশির দত্ত সম্পাদিত 'স্বনির্বাচিত' কাব্য সংকলনে আমি শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে আমার প্রিয় কবি বলেছি। বলি, ঠিকই তো। তুমি ও বিষ্ণু দে আমার প্রিয় কবি।
এই রে! কখন যে আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছি, খেয়াল করিনি। শক্তিও তার স্বচ্ছন্দ একেবারেই প্রথম এ কাজটি করেছে আমার সঙ্গে।
শক্তি গলা নাবিয়ে ধীরে ধীরে বলে, জানো? কী জেলাসি! কেউ কাউকে সামনের উপর মনের কথাটি বলতে চায় না।
আমি আমার দেশের সাহিত্যিকদের কোল্ড ওয়ারের কথা মনে করে হাসি। আমার নিজের ইনসিগ্‌ফিক্যান্ট সাহিত্যজীবনটুকু ছদ্মবেশী কাঁকড়াবিছের চোরা হুলে নীল হয়ে গেছে। পারলে লেখালেখির মাপ কোট্‌টুকু থেকে ছলেবলে ঠেলে বের করে দেয়। আমি শক্তিকে বলি, তুমি তো খুব জনপ্রিয় কবি। বড় কবিও...
তবুও... ছাপার অক্ষরে বলেছ। খোলাখুলি। অন্যদেশের কবি একজন। তোমার কী স্বার্থ?
আমি তোমার কবিতা অনেস্টলি ভালবাসি।
আমিও তোমাকে ভালবাসি। বাসবোও।
দেখা গেল, শক্তির ও আমার জন্মসন একই। বিয়ে করেছি একই বাগেরহাটে।
বিদিশা ও বাবুইতে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। ওরা একই ক্লাশে পড়ে। মিষ্টিমুখটুখের পর শক্তি আমাকে বলল, পরশু বিকেলে বিদিশাকে নিয়ে 'প্রতিক্ষণে' চলে এসো। ওদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী।
আমি তো নিমন্ত্রিত নই।
যাঃ। আমি শক্তি চাটুজ্জে নেমন্তন্ন করছি। আর কী লাগবে উঁ? আর হ্যাঁ, তরশু চার তারিখ সন্ধ্যেয় চলে আসবে দুজনে। খাবে এখানে। ভুলে যাবে না তো?
শক্তি ওর 'কক্সবাজারে সন্ধ্যা' বইটি উপহার দিল আমাকে। আমি আমার নতুন প্রকাশিত কাব্য 'হে লোকসভ্যতা।

৪ঠা জুলাই বিদিশাকে নিয়ে 'প্রতিক্ষণ' অফিসে যাই। সুন্দর একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠান। উৎসবের আঁচ লাগা। অনেক নতুন পুরনো সাহিত্যিক ও সাহিত্যপ্রেমীর চাঁদের হাটই জমেছে। কিন্তু অনুষ্ঠান শুরু হতে দেরি হচ্ছে চাঁদ না এসে পৌঁছনোর জন্যে। তিনি এলেন। অতি বৃদ্ধ। রাজার মতো কৌর রূপ। সাদা চুল সাদা দাড়ি সাদা পোশাক। বোঝায় যায়, যৌবনে নয়ননন্দিত সুপুরুষ ছিলেন। সবাই সমীহ করে কথা বলেছেন। ইনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুবাড়ির সাক্ষাৎ জীবিত বংশধর সুভো ঠাকুর।

এই অনুষ্ঠানে সবার অনুরোধ শক্তি মুখস্থ আবৃত্তি করল: 'অবনী বাড়ি আছো?' ঋষভ কণ্ঠে। কেটে কেটে গদ্যে কথা বলার স্টাইলে। যেন সামনের টেবিলের ওপারে অবনী লুকিয়ে আছে। এখুনি উঁকি দিয়ে বেরিয়ে পড়বে চেয়ার বা

টেবিলের তলা থেকে। ওয়াল্টার ডিলা মেয়ারের 'দ্য লিস্‌নারস্' কবিতা। নিঝুম জ্যোছনারাতে এক অচেনা আগন্তুক ঘোড়া ছুটিয়ে নির্জন জঙ্গলের মধ্যে এক প্রাচীরঘেরা ভুতুড়ে দুর্গের সামনে এসে দাঁড়ায়। ঘোড়া থেকে নেমে এসে দুর্গের প্রাচীন দরজায় মরিয়া হয়ে করাঘাত করতে থাকে: ইজ দেয়ার এনিবডি দেয়ার? ইজ দেয়ার এনিবডি দেয়ার? কোনো সাড়া নেই। বাইরে থেকে দেখা যায় দোতলায় সিঁড়ির রানায় চন্দ্রলোকে দাঁড়িয়ে কিছু রহস্যময় আবছায়া নিজেদের মধ্যে ফিস ফিস করছে। কোনো শব্দ নেই। আর ত্রস্ত আগন্তুক উন্মাদের মতো কড়া নেড়ে চলেছে : ইজ দেয়ার এনিবডি দেয়ার? নাকি, অবনী বাড়ি আছো?

এই অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বর্ণনা আজ থাকুক। কারণ শক্তিই এখনকার উপস্থাপ্য চরিত্র। শুধু এইটুকু বলি, অনুষ্ঠানের পর বেশ রাতে শক্তি আমাদের বাপবেটিকে 'প্রতিক্ষণ' সম্পাদক প্রিয়ব্রত দেবের গাড়িতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করে।

৫ই জুলাই বিকেলে শক্তির বাসায় এসে দেখি বেশ একটা মিনি আড্ডার আয়োজন। শক্তি আমার উপলক্ষে কয়েকজন একেবারে আপন বন্ধুকে আহ্বান করেছে। তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হতে একটু অবাকই হলাম। ইঞ্জিনিয়ার আছে। ব্যবসায়ী আছেন। কবিও আছেন। শক্তি হেসে বলল, জানো? আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা বেশিভাগই অকবি। কবিদের মধ্যে প্রধান উপস্থিত ছিলেন, তিনি অমিতাভ দাশগুপ্ত। তিনি বললেন, সিদ্দিকদা, তোমার গদ্য আমাদের খুব আদরের। অমিতাভ সম্পাদিত 'পরিচয়ে'র পুজো সংখ্যায় তখন আমার দু-একটা গল্প ও 'জলরাক্ষস' উপন্যাসের প্রথম তিনটে পরিচ্ছেদ ছাপা হয়ে গেছে। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটভাই উপস্থিত ছিলেন, মনে আছে। শক্তি বলল, সুভাষদার আসার কথা ছিল কিন্তু পারল না। নাতির অসুখ।

মুহূর্তের মধ্যে আসর জমে উঠল। শক্তি কায়দা করে বিদিশাকে বাবুইয়ের সঙ্গে ভিতরে পাঠিয়ে দিয়েছে। নানারকম নাস্তা ও পানের ব্যবস্থা। মীনাক্ষী বউদির একটা খাঁটি গুণ দেখলাম, কোনো কলকেত্তাই ভড়ং নেই। আপন করে নেন স্বাভাবিক আন্তরিকতায়। অতিথিকে তাঁর বাড়িতে 'উপরন্তু' বা 'ভার' মনে করতে দেন না।

বাংলাদেশে লেখালেখি নিয়ে উৎসাহ প্রত্যেকের মধ্যে। শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, রফিক আজদ, নির্মলেন্দু গুণ এঁদের প্রিয় কবি। সিকদার আমিনুল হকের কথা বলল শক্তি। একজন বললেন, বাংলাদেশের সাহিত্যে চড়া রাজনীতি। আমি বললাম, এটা আমাদের জন্মদোষ নয়, জন্মগুন। বদরুদ্দীন উমরের ভক্তও পাওয়া গেল। আমি হাসান হাফিজুর রহমান, মুনীর চৌধুরীর কথা তুললাম। আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারী, একাত্তর, জাতীয় সংগীত, বাংলা একাডেমিকে ওঁরা খুব শ্রদ্ধা করেন। শক্তি বলল, তোমাদের জল-মাটিতে কবিতা ভাল ফলবে বইকী।

গতদিনে আমার উপহার দেওয়া 'হে লোকসভ্যতা' কাব্যের ওই নামীয় কবিতাটিতে ব্যবহৃত 'সুলতানের তুলি' কথাটির অর্থ জানতে চাইল শক্তি। আমি অবাক হলাম এ দীর্ঘ কবিতা সে এরই মধ্যে পড়ে ফেলেছে জেনে। পরে বোঝা গেল, 'স্বনির্বাচিত'তে এই কবিতাটি ছাপা আছে। সেখান থেকেই আগে পড়ে নিয়েছে সে। শিল্পী এস. এম. সুলতান আমার বিশেষ শ্রদ্ধেয় বন্ধু। তাঁর বিচিত্র জীবনকাহিনী ও ছবির নিজস্ব স্টাইলের কথা শোনালাম। শক্তি তখুনি প্রোগ্রাম করে ফেলল, পরে যখন বাংলাদেশে যাবে, নড়াইলে গিয়ে দেখে আসবে সুলতানকে।

এরপর শক্তি আমাকে একটা খুব সুন্দর দামি জিনিস উপহার দিল। ১৯৮৪-এর নবম বইমেলা উপলক্ষে গ্রামোফেন কোম্পানি অব ইন্ডিয়া লি: প্রকাশিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার রেকর্ডেড সংকলন 'তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবো'র ক্যাসেট। কবিতাগুলোর আবৃত্তিকার শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ ও অমিতাভ দাশগুপ্ত। প্রথম পিঠে ১৪টি কবিতা : জরাসন্ধ, ছায়ামারীচের বনে, চতুর্দশপদী কবিতা ৭৭, পাথর গড়িয়ে পড়ে গাছ পড়ে বোধে, ছেলেটা, সংসারে সন্ন্যাসী লোকটা, শাক্য, যদি পারো দুঃখ দাও, আনন্দভৈরবী, রক্তের ভিতরে দোল-দুর্গোৎসব, একা গেলো, যার জন্যে তুমি, এপিটাফ ও যেতে পারি কিন্তু কেন যাব। এ পিঠের সব কটি কবিতাই আবৃত্তি করেছেন কবি স্বয়ং। অপর পিঠে আছে : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কণ্ঠে— একদিন বহুদিন বেদনায় বহুদিন অন্ধকারে, শব্দের বিষাদ, অবসর নেই, টেবোর বাংলায় রাত ও বিরহ তার পাত্রে থেকে আগুন ঢালছে। কবিতা সিংহের কণ্ঠে: —ভ্রান্তি, একবার তুমি, জুলেখা ডবসন, চাবি একটি পরমাদ ও দূরগামী গাড়ি, অমিতাভ দাশগুপ্তের কণ্ঠে:— বাঘ, অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে ও আমরা সকলেই।

ক্যাসেটের ফ্ল্যাপে শক্তি লিখে দিল : 'সিদ্দিকভাইকে শক্তি ৫/৭/৮৪'। অমিতাভও আদর করে লিখলেন অপর প্রান্তে: 'প্রিয় সিদ্দিকভাই...কে অমিতাভ'। শক্তির তাতেও মন সারে না। মূল কাসেটের গায়ে আবার তারিখ দিয়ে নাম সই করে।

ক্যাসেটটি তখনই টু-ইন-ওয়ানে চাপিয়ে সুইচ অন করে দেওয়া হল। সারা কামরা গমগম করে উঠল কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নাদমন্ত্র কণ্ঠের আওয়াজে, ফার্সিতে যাকে বলে বুলন্দ আওয়াজ: আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে...। বাহ্য আবেগহীন সুরহীন ছেদপ্রধান দীর্ঘ বিরতি দিয়ে দিয়ে ঠান্ডা গদ্যময় এই চোখা উচ্চারণ; এই সংযমেনর

চাল আমার ও আমাদের অভ্যস্ত গতিশীলতা থেকে কত দূরস্থায়ী। 'আমাকে তুই' বলে একটা পুরো শ্বাস নিয়ে থেকে তারপর 'আনলি কেন' বলে জিজ্ঞাসার মত ছুড়ে দেওয়া; এত নিরাবেগ! ভাবা যায়? 'ছায়ামারীচের বনে' কবিতায় 'সহিতে পারি না গভীর...' -এ 'ভী' -এর দীর্ঘ টান বা 'ছেলেটা' কবিতা 'কেটে' বলে একেবারে প্রবন্ধ পাঠের মতো লম্বা বিরতি দিয়ে তারপর 'ছড়িয়ে দিলে পারতো', ...অত্যন্ত ঋজু উচ্চারণ। 'পাথর গড়িয়ে পড়ে' কবিতায় দুবার করে পড়া' এখন সে কে জানে', ..স্বগতভঙ্গিতে উচ্চারিত।। শক্তি যখন আবৃত্তি করছেন : 'ইন্দ্র! ইন্দ্র!' মনে হয়েছে যেন সামনেই ক্যাশবাস্ক কোলে নিয়ে কাঁপছে প্রকাশ বা ক্যাশিয়ার। আর পাওনাদার কবি তার জামার কলার ধরে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে চার্জ করেছেন। আবার এই একই কবিতায় যখন 'অথচ' কথাটা উচ্চারণ করেন কবি, তখন সে কত সংযত! মুহূর্তের মধ্যে একটা ফিলসফিক্যাল উদাসীনতা ছড়িয়ে পড়ে ঘরে! 'সংসারে স্বেচ্ছাচারী' কবিতাটি কবি পড়ে গেলেন অদ্ভুত ব্যক্তিগত ঘোষণার মতো। প্রকৃতই অ্যাসার্টিভ টোন। 'শাক্য' কবিতায় কী মর্মস্পর্শী স্বরে ব্যক্ত হল 'ভালবাসি' শব্দটি ও তার পরে ধ্বনিপ্রবাহ। তেমনি 'আনন্দভৈরবী'তে এসে যখন কবি বলেন, 'সে কি জানিত না...' অকম্পিত শীতল বলেই সে কণ্ঠধ্বনি শ্রোতার বুকে এসে ঘা মারে। এত স্পর্শী! 'একা গেল' কবিতাটির পড়ার গুনে মনে হল প্রফেটিক কিন্তু বেদনাদায়ক। যখন 'ভুল হয়ে গেছে' বলছেন কবি, কণ্ঠস্বর ও জায়গাটায় তখন কম্যান্ডিং উদারামুদারার মধ্যে সঞ্চলনশীল 'বাড়িতে মৃন্ময়ী নেই, দাগ গেছে গেছে' লাইনটি আবৃত্তি করার সময় মনে হল যে মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনের প্রেমমোহকে নতুন ভাষ্য শোনালেন কবি। কণ্ঠস্বর -এ জায়গাটায় পৌঁছে খুব জীবন্ত। আবার উদাত্ত হয়ে ওঠে 'জানো একা কোন কিছু' বলে বলতে। তারপর একটি জীবন্ত স্মৃতিচিত্র ভেসে ওঠে 'এই সেই পুকুরপাড়' লাইনগুলো শুনতে শুনতে। শক্তির কণ্ঠে শেষ কবিতা 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো?' 'চাঁদ ডাকে' বলার পর তিন তিনবার কেমন থেকে থেকে গম্ভীর গলায় শক্তি আহ্বান করেন: আয় আয়! মধ্যে আষাঢ়ের রহস্যঘেরা কামরার সমস্ত জীবন অভিভূত হয়ে যায় এক ধরনের আনক্যানি মিস্টিক থমথমানিতে।

উল্টে পিঠ শুরু সুনীল গঙ্গোপাধ্যাকে দিয়ে। সুনীলের পাঠ আবৃত্তি সচেতন; উচ্চারণ গতিময়, কিছুটা বা দ্রুত, শক্তির মতো অত বিরতিনির্ভর নয়। উত্থানপতনও কম। এরপর কবিতা সিংহ। ভরাট টানা মর্যাদাশীল গলা; আকারাস্তিক। তাঁর স্টাইল একটা মদালস ও আবেগময়, ফলে নাটকীয়। একেবারে শেষ অমিতাভ দাশগুপ্ত। তাঁর কণ্ঠটি ঋজু ও গদ্যময়, অনেকটা শক্তি ঢং।

ভিতরের আবহাওয়া হার্দ ও মর্মী। কীভাবে যেন গাঢ় হয়ে গেছি আমরা পরস্পর। বন্ধুরা বিদায় নিলে একে একে। মীনাক্ষী ডাক দিলেন ভিতরে।

শক্তি আমাকে নিয়ে বসিয়ে দিল ডাইনিং টেবিলে। সঙ্গে তার ছেলেমেয়ে । স্বামী-স্ত্রী কাউকে বসানো গেল না। তদারকিতে ব্যস্ত তারা। মীনাক্ষী বউদি কোনো ত্রুটি রাখেননি আয়োজনের। খাওয়া শেষ করে লজ্জা পেয়ে গেলাম শক্তির আচরণে। কতক্ষণ ধরে আমার চেয়ারের বিছনে তোয়ালে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, জানতে পারিনি। নিজেকে অপরাধী মনে হল ভিতরে ভিতরে। আমার বাড়ি গেলে এতটা সৌজন্য বা আন্তরিকতা যা-ই বলি না কেন, দেখানোর কথা খেয়ালই করতাম না আমি। মনে মনে সেদিন শক্তি ও তার পরিবারের সঙ্গে নিবিড় প্রীতিবন্ধ হয়ে যাই আমি।

আট

শক্তির কবিতা আমাকে আঁকশির মতো টানে। পড়তে পড়তে আমি একটা আলাদা জগতে অবলীলায় প্রবেশ করি। পাঠককে এভাবে অধিকার করতে পারা বড় কবির কাজ।

ঢাকায় গেলেই আমি নতুন বইয়ের খোঁজে স্টেডিয়ামের পশ্চিমগেটের উপরকার দোতলায় অধুনালুপ্ত ম্যারিয়েটায় চলে যাই। ১৯৮৬-এর ডিসেম্বরে ঢাকায় গেছি। এক কবিবন্ধু খবর দিলেন, ম্যারিয়েটায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নতুন কবিতার বই এসেছে; 'সন্ধ্যার সে শান্ত উপহার'। যাবো যাবো করেও যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। খুব উৎকণ্ঠা। বই আছে না ফুরিয়ে গেল? কী সব হাবিজাবি কাজে আটকে যাচ্ছি। এর মধ্যে আবার স্নেহভাজন আলী ইমাম ধরে নিয়ে গেল জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে মিলনায়তনে, ছোটদের এক সাহিত্যসভায়। ওখানে বসে বসেই জিদ করি, কাল যাবোই ম্যারিয়েটা। কেউ ঠেকাতে পারবে না। অনাবিল আনন্দ নিয়ে সে রাতে টি.এস.সি-এর পাঁচ নম্বর রুমে ফিরে আসি। আগামী দিনের সকাল অগ্রিম সুঘ্রাণ পাঠিয়ে বিভোর করে রেখেছে আমার রাতটুকু। একসময় বিছানায় উঠে বসে একটা কবিতা লিখে ফেলি: 'চলো আজ ম্যারিয়েটা যাই'। সময় রাত দেড়টা। তারিখ ২৮/১২/৮৬।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা অন্য অনেকের মতো আমারও সর্বসত্তা জুড়ে। আর জীবনানন্দ একসময় আমার ইন্দ্রিয় স্নায়ুবোধ, সবখানে ছিলেন গলিত মদিরার মতো। আর শক্তির কবিতা পাক দিয়ে ফেরে মাথার মধ্যে। তার উপমা ও প্রতীকগুলো এক জাদুযানে তুলে নিয়ে যায় বিশুদ্ধ কোনো কষ্টের আকাশে। তাঁর শব্দ ও চরণ আমি আমার লেখায়ও উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করতে ভালবাসি। বই আকারে আমার এযাবৎ কালে মুদ্রিত যে দুটো মাত্র উপন্যাস, তাদের সূচনা

করেছি শক্তিরই কবিতার চরণ দিয়ে। প্রথম উপন্যাস 'জলরাক্ষস' -এর শুরু আগের পৃষ্ঠায় শক্তির এই লাইনগুলো উদ্ধৃতির মাধ্যমে:

পাড় খসে পড়ছে নদীর, নদী
চওড়া হচ্ছে, দুদিকেই তার বাড়বাড়ন্ত
ফুলে ফেঁপে জল কামড়ে ধরছে মানুষের
ঘরবাড়ি গেরস্থালি তছনছ
জল যাচ্ছে গড়িয়ে তেড়ে, বাদা ভেঙে
মাঠ গুঁড়িয়ে কাৎ হয়ে পড়ছে গাছপালা
ডাঙ্গা থেকে তালকানা পাখি মারছে
আকাশের দিকে লাফ, পরিত্রাণ
চাই, বাঁচতে চাই, বেঁচে থাকতে চাই
শুধু বাঁচা, অহরহ মৃত্যুর ওলোটপালটের
মধ্যে বেঁচে থাকতে চাই, শুধু বাঁচতে চাই।

'খরাদাহে'র আরম্ভ কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় এই লাইনটি দিয়ে :

'মানুষ বড় কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও।'

১৯৮৭-এর ৩০ সেপ্টেম্বর। শক্তির সঙ্গে দেখা হতে হতেও হল না। ওই দিন দুপুরে ঢাকায় পৌঁছে সায়েন্স ল্যাবোরেটারির গেস্টহাউসে উঠি। চানটান সেরে উপহারের প্যাকেট নিয়ে চলে যাই মিরপুর রোডে ঢাকা কলেজের পশ্চিমে কমিউনিটি সেন্টারটিতে। ওয়াপদার সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু জুলফিকার হোসেনের কন্যা ফ্লোরার বিয়ে। বিয়েবাড়ির হল্লা বরাবর বিরক্তিকর লাগে। বইয়ের প্যাকেটটা বন্ধুর ভায়রার হাতে ধরিয়ে দিয়েই সরে পড়ি। রিকশা নিয়ে সোজা সিকদার আমিনুল হকের বাসায় চলে আসি। সিকদার আমাকে দেখে খুব আফশোস শুরু করে দিলেন। কারণ? কারণ মাত্র চল্লিশ মিনিট আগে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় সপরিবারে তাঁর গৃহ ত্যাগ করেছেন। যাবার সময় নাকি খুব সুস্থ ছিলেন না। ঢাকা থেকে জলপথে বরিশাল-পিরোজপুর হয়ে বাগেরহাট যাবেন। মীনাক্ষী বউদির বাপের বাড়ি দর্শনের ইচ্ছে। গাজি স্টিমারে ওঁদের যাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন সিগদারবান্ধব মন্ত্রী মঙ্গদুল ইসলাম।

শুনে মন খারাপ হয়ে গেল। শক্তি যখন বিদায় নিচ্ছেন, আমি তখন সায়েন্স ল্যাবরেটারি বাথরুমে। সিকদারের বাসা সামনেই।

সত্যি মিথ্যে জানি নে। পরে গোরাইদার মুখে শুনেছি, শক্তি নাকি বাগেরহাট শহরে গিয়ে কলেজরোডে আমার অতীত বাসভবনের সামনে দাঁড়িয়ে আমার নাম ধরে চেঁচিয়ে কবিতালাপ করেছে। গোরাইদার বাসা তার সামনে।

প্রায় একটি বছর পর ৩.৮.৮৮-তে কলকাতায় কর্নেল বিশ্বাস রোডের বাসায় আমার শক্তিসন্দর্শন। সে এক অসহ্য ঘামের গুমটভারী দুপুরবেলা। অফিস থেকে নারায়ণকে নিয়ে ট্যাক্সিতে চেপে বসি। সঙ্গে নাড়ুর এক সহকর্মী। মীনাক্ষীকে নাড়ু আগেই বলে রেখেছিল। মনে হল অপেক্ষা করছিল শক্তি। দরজা খুলে আমাকে দেখে একেবারে উল্লাসমত্ত অবস্থা। খালি বুকে সাদা পশম। গলা ফাটিয়ে তারস্বরে রবীন্দ্রসঙ্গীত। এবং গাইতে গাইতে ঘেমো বুকের মধ্যে আমাকে সজোরে চেপে ধরা। চাপ খাওয়া দমচাপা অবস্থায় আমি মিনতি করি, আস্তে শক্তি। তোমার প্রতিবেশীরা চিৎকার শুনে কী ভাবছেন? আমার লজ্জা আর তার আনন্দ। অদ্ভুত ছেলেমানুষি উত্তেজনার সেই দৃশ্য আমাকে টেনে নিয়ে যখন ঘরের ভিতর সোফায় বসিয়ে দিল, তখনও আমার বিব্রত দশা কাটেনি। প্রচুর মিষ্টি নিয়ে এলেন মীনাক্ষী। মন খুলে একনাগাড়ে বকে চলেছে শক্তি। হঠাৎ করে এক লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সম্পাদকের নাম ধরে কটুকাটব্য। কবির লড়াইয়ের চাকে ঢিল। সমস্ত তরুণ কবি, সদর ও মফস্‌সলের আর তাঁদের পৃষ্ঠপোষক কত লিট্‌ল ম্যাগ সব একযোগে রণং দেহি শক্তির বিরুদ্ধে। গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বয়ে যাচ্ছে শক্তিসংহার - তরঙ্গ। উদ্দিষ্ট সম্পাদক আমার বেশ ঘনিষ্ঠজন। মাথা ঝুঁকিয়ে বসে থাকতে হয়। ভাবি, সাহিত্য এত পবিত্র বস্তু কিন্তু তার কারবারিরা কেন জটিল? আবার নোংরাও? পশ্চিমবঙ্গ - বাংলাদেশ সবখানে দলবাজি, কুৎসাকর্দম, ঘাঁটঘাঁট, চামচা পোষার রেওয়াজ মনটা বেসুরো হয়ে গেল। শক্তি ভীষণ জেদাজেদি আরম্ভ করে দিল মীনাক্ষীর সঙ্গে। প্রিয় বন্ধুর আগমন সেলিব্রেট করতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। গ্লাস আসছে না কেন এখনও? আমি নাড়ুর দিকে চেয়ে চুপসে যাই। নাড়ুর ফরসা মুখ ঘেমে লাল। শক্তি আমার হাত ধরে সায় আদায় করতে ব্যস্ত। ডান হাতের অংগুষ্ঠও তর্জনির ডগাযুক্ত করে কিঞ্চিন্মাত্র পরিমাণের জন্যে অনুমতি চায়। মীনাক্ষীর দুচোখে শাসন। অগত্যা ওকেই একা উঠে যেতে হয় ভিতরকামরায়। কিছুক্ষণ পর রসেবসে দুলতে দুলতে ফিরে এল। ঘরের আবহাওয়া এতক্ষণে ধাতস্থ। আমি ওকে নিয়ে লেখা 'চলো আজ ম্যারিয়েটা যাই' কবিতাটি পড়া শুরু করি। শেষ হয়। খুশিতে শক্তি ঢক ঢক করে আবার কয়েকটি ঘন চুমুক

লাগায় গ্লাসে। চোখ বুঁজে বলতে থাকে, কোনো মাল থাকবে না। না আমি না পদ্য, খামোকা!... কী রকম দার্শনিক হয়ে গেল পরিস্থিতি! ভেতরে উঠে গেল নিঃশব্দে। দুটো বই নিয়ে এল : 'জ্বলন্ত রুমাল', 'পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি'। নাম সই করে দিল। গালে ডান হাত চাপা শক্তির এ ছবির আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। বলল, তিনটে দিন একটু ব্যস্ত আছি। সাত তারিখে বিকেলে একবারটি এসো। একটি জিনিস দেব।

৭.৯.৮৮ -এর সন্ধ্যায় বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে গিয়ে হাজির হলাম। আজও খুব খুশি। তবে সংযত। কথায় কথায় অনেক প্রসঙ্গ উঠে পড়ল। বিষ্ণু দে'র সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা তুলল। তাঁর কণ্ঠস্বরের প্রশংসা করল। তারপর গলা নামিয়ে গাঢ়স্বরে বলতে লাগল, তুমি যশোর বর্ডারে একটা গাড়ি নিয়ে বসে থাকবে আমার জন্য। আমি টুপ করে চলে যাব তোমার কাছে। রাজশাহীতে পদ্মার হাওয়া খাব মাছ খাব। তোমার কাছে জিওল মেরে থাকব কদিন। তোমার বউ চুনোমাছ তো ভালই রাঁধে, না কী বলো?

শক্তি এত নিঃসঙ্গ! আমরা সবাই তাই। কবিতাকে ভালবেসে সবাই সংসারে সন্ন্যাসী-নিরাশ্রয়ে নিঃসঙ্গ তায় ক্ষতবিক্ষত। ভিতরটা হু হু করে ওঠে নীরবে। বলি, কী জানি দেবে বলেছিলে?

শক্তি জবাব দিল না। উঠে গিয়ে টেবিলে বসল। সাদা কাগজে খস খস করে কিছু লিখে চলল। তারপর কাগজটা এনে আমার হাতে দিল। উপরে লেখা : 'দশমী ও বিসর্জনে'। নীচে ওর নাম। তারপর চারলাইন কবিতা। আঠারোমাত্রিক পায়ের। নীচে ডান পাশে লেখা: 'আবুবকর সিদ্দিক পরমপ্রিয়েষু', 'তার নীচে শক্তি', তার নীচে: ৭.৯.৮৮। আমাকে খুব কষ্টে চোখের পানি চেপে রাখতে হয়। বলি, রাত ঘোর হয়ে এল, উঠি আজ। শক্তিও ওঠে আমার সঙ্গে। বাইরের দোরগোড়ায় পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়ে থাকে।

দশমী ও বিসর্জনে
শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ভলোবাসা দিয়ে আমি তোমার সর্বাঙ্গ মুড়ে দেবো,
ফুলে ও কাঁটায় আমি তোমার সর্বাঙ্গ মুড়ে দেবো,
যাতে ফুল পেতে গেলে আমিও কাঁটায় বিদ্ধ হই,
অন্য কোনো অন্ধ চোখ কেবলি কাঁটার ঝাঁটা খাবে।

আবুকর সিদ্দিক পরমপ্রিয়েষু
৭.৯.৮৮
শক্তি

নয়

আবার ছ বছর রপ ১৯৯৪-তে দেখা এবং এ দেখাই শেষ দেখা। অর আগের বছর অবশ্য একপলকের জন্যে শক্তির বেলেঘাটার বাড়িতে গিয়ে ফিরে আসি। তারিখ ১৯.৯.৯৩। দেখা হয়নি। তাতার বলল, বাবা তো আপনাদের দেশে গেছেন। সে তো আমাকে চিঠি দিয়ে জানাবে আগে। পরে জেনেছি, শক্তি সুন্দরবনে চলে গিয়েছিল সে দফায়।

এরপর গত ৬.৯.৯৮-তে ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেই ওর বাড়িতে যাই। অনেকটা দূর এ বাড়ি। ৫ নং রামমোহন মল্লিক গার্ডেন লেন। শেয়ালদা থেকে পুব দিকে বেলেঘাটায় জোড়ামন্দিরের পেছনে। এই বাড়িটা একটু ভিতরের দিকে। খুব নিরিবিলি শান্ত। একতলা। ড্রয়িং রূমে ঢুকেই মনটা প্রসন্ন হয়ে আসে।

মীনাক্ষী দেখা দিয়ে কুশলবিনিময় করে অফিসে ছুটলেন। এবারের শক্তি অনেক স্থির ও স্বাভাবিক। তবে চোখে চক চক করে উঠেছে আনন্দ ও তৃপ্তি। এ কথা সে কথার পর বলল, থেকে যাও এ বেলাটা। একসঙ্গে খাব। গল্প করব। আমার জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল দুপুরে। বিকেলে আবার গড়িয়াহাটায় 'সাহিত্যিকা'তে বক্তৃতা। ক্ষমতা চেয়ে নিই ওর কাছে।

তোমাকে কিছুদিন আগে টিভিতে দেখলাম যেন। রাতের নিউজে।
হ্যাঁ। রমেশ সেনের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে। এবারে আসাও সেই উপলক্ষে।
বসে বসে ড্রইংরুমের দেয়ালজোড়া চমৎকার ভারতীয় শিল্পের কারুকাজ দেখছিলাম। জিজ্ঞেস করি, এবাড়ি ভাড়া কত?
নিজের বাড়ি। বানিয়েছি।
বাঃ! একটা কাজের কাজ করেছ!
হ্যাঁ, কখন কী হয়!

তোমার শরীর কেমন এখন?
চলছে। তোমার ব্লাডসুগার ঠিক আছে তো?
হ্যাঁ। কেনো বলো তো?
তোমার জন্যে মিষ্টি রাখা আছে। তুমি তো মিষ্টি খুব ভালোবাস।
বাবুইকে ডেকে মিষ্টি দিতে বলল। শক্তি খেলো স্রেফ কফি।

ওর 'পদ্যসংগ্রহ' ১ম ও ২য় খণ্ড নাম লিখে উপহার দিল। বলল, ৩য় খণ্ডের কাজ চলছে। বেরুলে রেখে দেব তোমার জন্যে। খানিক থেকে আবার বলল, এসো দুজনে মিলে দু বংলার কবিতা সংকলন করা যাক। এদিককার খাটাখাটুনি সমীরকে দিয়ে করিয়ে নেব। তুমি, ঢাউস নয়, তবে চোখা একটা সম্পাদকীয় লিখবে তোমার দেশের কবিতার। এ দিকেরটা তো আমি আছি।

বেশ ভাল লাগছিল এ সব কথাবার্তা। মেয়ে বাবুইকে ডেকে বলল, ছবি তোল তো আমাদের। মেয়ে ছবি তুলল ক্যামেরায়। আমি বাবুইকে কানে কানে বলি, কেমন যাচ্ছে বাবার শরীর?
বাবুই হেসে ফিস ফিস করে বলল, বাবা রিটায়ার করেছেন।
আমার মেয়ে বিদিশার খবর জানতে চাইল শক্তি। নতুন করে অনেক সব লেখার আছে মনে মনে। শুরু করে দিতে হবে বলল।
আরও বসতে ইচ্ছে করছিল। দেরি হয়ে যাবার ভয়। তাই উঠতে হল।
শক্তির শেষ কথাটি ছিল, এবারে যখন ফের আসবে, তোমাকে নিয়ে খুব বেড়াব। অনেক দূরে দূরে। আমার আর যাওয়া হয়নি। গত ২৩.৩.৯৫ বৃহস্পতিবার ভোর পাঁচটায় শক্তি একাই বেড়াতে বেরিয়ে গেছে। অনেক দূরে দূরে!